কাঠগড়ায় গল্প

সচলায়তন বিষয়ভিত্তিক সংকলন: না বলা কথা

কাঠগড়ায় গল্প

সচলায়তন বিষয়ভিত্তিক সংকলন: না বলা কথা

প্রকাশায়তন

কাঠগড়ায় গল্প

সচলায়তন বিষয়ভিত্তিক সংকলন: না বলা কথা

প্রথম অন্তর্জাল সংস্করণ

ফাল্গুন ১৪১৫ | ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক

অমিত আহমেদ

প্রকাশায়তন, ঢাকা- ১২১৩

© sachalayatan.com

aumit.ahmed@gmail.com

সহযোগীতায়

নিঘাত তিথি

আনোয়ার সাদাত শিমুল

মু. নূরুল হাসান

প্রচ্ছদ

অমিত আহমেদ

ISBN

984-300-003082-7

'**Kathgoray Golpo**' a collection of Bengali journal/fictions; edited/published by Aumit Ahmed on behalf of Prakashyatan, sachalayatan.com; cover designed by Aumit Ahmed; first Internet edition published on Falgun 1415, February 2009.

মুখবন্ধ

প্রিয় পাঠক,

"কাঠগড়ায় গল্প" সচলায়তনের চতুর্থ ই-বই। আমাদের পূর্ব-প্রকাশিত বইগুলোর চেয়ে তুলনামূলক ভাবে এবারের বিষয়বস্তু "না বলা কথা" হয়তো একটু স্পর্শকাতরই ছিলো। স্পর্শকাতর বলছি এ কারণে যে, যেসব কথা বলা হয়নি সেসব না বলার নিশ্চই উপযুক্ত কারণ আছে। আমরা লেখা আহবান করলেই কেনো লেখকেরা তাদের না বলা কথা সবার কাছে উন্মুক্ত করে দেবেন?

তবে সব না বলা কথাই কিন্তু গোপন কথা নয়। অনেক কথাই তো আমরা কাকে বলবো বুঝে পাই না। অভিযোগের কথা, অভিমানের কথা, অপমানের কথা, ফেলে আসা কোনো বেদনার কথা। আবার কখনো কাউকে কিছু বলতে গিয়েও লজ্জা, সংকোচে কিংবা সুযোগের অভাবে আর বলা হয়ে ওঠে না। বিচ্ছিন্ন কতো কিছু। বাবা-মা' কে মুখ ফুটে বলতে পারিনা তাঁদের কতো ভালোবাসি। মোড়ের বাকি দেয়া চা-ওয়ালাকে বলতে পারি না, ভাই ধন্যবাদ। রাগের মাথায় হুট করে কিছু করে বসে পরে আর বলা হয় না, মাফ করে দিস। কিংবা অফিসের বড়কর্তাকে বলতে গিয়েও বলা হয় না, তুই উচ্ছন্নে যা!

এমনই কতো গল্প-কাহিনী। জীবন থেকে নেয়া অভিজ্ঞতা। ভিন্ন স্বাদের, মাত্রার; ভিন্ন সমাজ আর কাঠামোতে। কোনো লেখা আপনার দু' চোখ ভরে জল আনবে; কোনো লেখা পড়ে আবার কিছুতেই হাসি চাপতে পারবেন না; পরের লেখাতেই হয়তো দাঁতে দাঁত ঘষবেন রাগে... আবার পর মুহূর্তেই মন ভালো হয়ে যাবে অদ্ভুত কোনো ভালো লাগায়। এ যেনো এক অলৌকিক যাত্রা! আমরা জানি। নিশ্চিত ভাবেই জানি। কারণ আমাদের হয়েছে এমন!

ভালো থাকবেন।

অমিত আহমেদ
প্রকাশায়তন

সূচিপত্র

শিরোনাম, লেখক কিংবা ব্লগনামের উপর ক্লিক করে সরাসরি লেখায় চলে যান।
লেখা শেষে ব্লগনামের উপরে ক্লিক করে আবার সূচিপত্রে ফিরে আসুন।

শিরোনাম	লেখক	*ব্লগনাম*	পৃষ্ঠা
দাগ	রণদীপম বসু	*রণদীপম বসু*	৬
সময়ের পরিবর্তন	সৈয়দ আহমেদ আদনান	*বুনো জারুল*	৯
ছাঁটা ফুলের আসন	দময়ন্তী	*দময়ন্তী*	১০
না বলার মতো কথা	মাহবুব আজাদ	*হিমু*	১২
কিচ্ছুটি চাইনি	রায়হান আবীর	*রায়হান আবীর*	১৩
ডাম্বো হাতি	ইশতিয়াক রউফ	*ইশতিয়াক রউফ*	১৪
ঘরে যাইতে পথ মোর হইলো অফুরান	তুলিরেখা প্রত্যূষা অহনা	*তুলিরেখা*	১৬
বেঈমান দুনিয়া	অবাঞ্ছিত	*অবাঞ্ছিত*	১৯
ঝামেলামানুষ-৩	রানা মেহের	*রানা মেহের*	২১
অকথ্য ব্যক্তিগত	মুজিব মেহদী	*মুজিব মেহদী*	২২
কাছের মানুষ, দূ রে র মানুষ	অতন্দ্র প্রহরী	*অতন্দ্র প্রহরী*	২৩
মিলন স্যার	নিঝুম মজুমদার	*নিঝুম*	২৫
তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে...	অম্লান অভি	*অম্লান অভি*	২৭
কেমন আছো রোজালিন?	মৃদুল আহমেদ	*মৃদুল আহমেদ*	২৮
প্রেমের ভরাডুবি	শেখ জলিল	*শেখ জলিল*	৩০
বিয়ের গল্প	অদ্ভুৎ বলাই	*অদ্ভুৎ বলাই*	৩২
লে ভয়াজ ডি দিনাজপুর	এস এম মাহবুব মুর্শেদ	*এস এম মাহবুব মুর্শেদ*	৩৭
সত্যযুগেও সেদিন ছিলো কলিযুগ	জিজ্ঞাসু	*জিজ্ঞাসু*	৪১
... এবং অবশেষে	ধুসর গোধূলি	*ধুসর গোধূলি*	৪৩
গুডবাই চিঠি	মাশীদ আহমদ	*মাশীদ*	৪৪
আমার ঘর ছাড়ার গল্প	কীর্তিনাশা	*কীর্তিনাশা*	৪৬

অপরাধী	আশেক ইয়ামিন	*নির্বাক*	৪৭
নদীবর্তী রূপকথা	হাসান মোরশেদ	*হাসান মোরশেদ*	৪৯
একটা চাকরি হবে?	অমিত আহমেদ	*অমিত আহমেদ*	৫০
জীবন থেকে নেয়া	তানবীরা তালুকদার	*তানবীরা*	৫৩
তার সঙ্গে রাতের ভেতর, চিতার গন্ধ থেকে	সুমন সুপান্থ	*সুমন সুপান্থ*	৫৫
যেভাবে কাছে আসে আরেকটি গদ্যগগন	ফকির ইলিয়াস	*ফকির ইলিয়াস*	৫৬
শুদ্ধতা	এম. এ. মুকিত	*জ্বিনের বাদশা*	৫৮
বসন্তের চৈতালী গ্রীষ্মে	পান্থ বিহোস	*পান্থ বিহোস*	৬১
সামার	শামীম হক	*শামীম হক*	৬২
আমি যখন চুর আছিলাম...	কিংকর্তব্যবিমূঢ়	*কিংকর্তব্যবিমূঢ়*	৬৪

রণদীপম বসু

দাগ

রুমে ঢোকার মুখেই প্রথম বাধা, ব্যাগ আর জুতা রেখে যান। নির্দেশসুলভ কণ্ঠে ভদ্রতার ছোঁয়াটুকুও নেই। পোর্টফোলিও ব্যাগটা দরজার পাশেই নামিয়ে রাখলাম। জুতা-মোজা খুলে রেখে ভেতরে ঢুকতেই সামরিক পোশাক পরা দ্বিতীয় লোকটার ইঙ্গিত আমার মাথার দিকে। পূর্ণমুণ্ডিত বিরলকেশ মাথাটা উন্মুক্ত করে চারধার উঁচু করা গোলাকার সাদা ক্রিকেটিয় ক্যাপটা নামিয়ে পাশের টেবিলে রাখতে যাচ্ছি, আরেকজন সামরিক কায়দার লোক এসে ক্যাপটা নিয়ে গেলো। ভেতরের আরেকটা রুমে ঢোকার দরজার পাশে মেঝেতে ফেলে রাখলো।

ওটা কী? দ্বিতীয় ব্যক্তিটির প্রশ্নে ফের মনোযোগ ফিরে এলো এদিকে। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার ব্রম্মতালুর দিকে। কম করেও প্রায় ছ' ফিট উঁচু অবস্থান থেকে পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি আমার তালুতে সদ্য জোড়া-তালি সেলাইয়ের আড়াআড়ি দাগটা তাঁর চোখে পড়তে কোনো সমস্যা হয়নি। আমি মৃদু স্বরে উত্তর করলাম - দাগ।

কিসের দাগ?

সেলাই।

এবার বুঝি তাঁর কমান্ডিং স্বরটা গাঢ় হয়ে উঠলো - কী হয়েছিলো ?

ভরা কলসির কানা ডেবে গিয়েছিলো।

আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হলো কি হলো না বোঝা গেলো না। উজ্জ্বল চোখ দু' টো আমার চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাক করে রেখে প্রায় থ্রি কোয়ার্টার হাত দৈর্ঘ্যের অদ্ভুত লাঠি জাতীয় জিনিসটার অগ্রভাগ দিয়ে দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলো। নির্দেশমতো উল্লম্ব স্কেলটা ঘেষে দাঁড়ালাম। একজন হাঁক দিলো, সিক্সটি সিক্স।

এবার বিপরীত দিকের দেয়ালে ঝুলানো একটা বড় পর্দার দিকে তাকানোর নির্দেশ। ওখানে একজন দাঁড়ানো। পর্দায় অংকিত সারি সারি বিভিন্ন আকৃতির ইংরেজি আলফাবেটস। একটা স্টিকের মাথা এলোপাথারি বিভিন্ন বর্ণের উপর রাখছে আর প্রশ্ন ভেসে আসছে, এটা কী? এটা? ওটা? আমিও দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। এরই মধ্যে আমার পাশে দাঁড়ানো লোকটা প্রথমে আমার বাঁ চোখ, তারপর ডান চোখ চেপে ধরছে আর একইভাবে ওদিক থেকে প্রশ্ন।

এবার দ্বিতীয় লোকটা আমার কাছে এসে ছোট্ট লাঠিটা থুতনির নীচের দিকে ছুঁইয়ে উপরের দিকে চাপ দিতে দিতে বললো - হা করুন।

আমি আলতো হা করলাম।

আরো বড় করে...।

আমি তাই করলাম। বাঁ হাতে ধরা ছোট্ট টর্চটা আমার মুখের ভেতর আলো ফেললো। তৃতীয় সামরিক ব্যক্তিটির হাতে অদ্ভুত লাঠিটা ধরিয়ে দিয়ে তার বাড়িয়ে দেয়া চামচের মতো যন্ত্রটা নিয়ে সোজা আমার মুখের ভিতর হলকম অবধি ঢুকিয়ে দিলো। এবং জিহ্বার উপর নীচ ডানে বামে কতক্ষণ নাড়াচাড়া করে চামচটা বের করে নিয়ে পেছনের চেয়ারটাতে বসার ইঙ্গিত করেই বললো - শার্ট খুলুন।

আমি শার্ট খুললাম, ভেতরের গেঞ্জিও খুলতে হলো। উদোম গায়ে চেয়ারটাতে বসতেই আবার কমান্ড - এভাবে থাকুন।

ঘাড়টা একপাশে কাত করে রাখলাম আমি। প্রথমে ডান কান, পরে বাম কানেও কী সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চললো। এদিকে আরেকজন আবার ডান হাতে প্রেসার মাপার যন্ত্র জাতীয় কিছু ফিট করে নিয়েছে। চোখ দু' টোকে নিয়ে হামলে পড়লো আরেকজন। তারপরে নাকটাকে। মাথাটা প্রায় চিৎ করে নিয়ে নাকের ছিদ্র দিয়ে কী একটা ঢুকিয়ে দিলো। টর্চ ফেলে দেখলোও আরো কী কী যেনো। সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটতে লাগলো।

অল্পক্ষণ পরেই ভেতরের দরজার দিকে ইঙ্গিত, অর্থাৎ পরের রুমে। নিরবে কমান্ড পালন করছি। দরজার পাশে আমার টুপিটাকে আড়াল করে শার্ট আর গেঞ্জিটা পড়ে আছে মেঝেতেই। পাশের রুমে ঢুকার আগেই কমান্ড, প্যান্ট খুলে যান।

জ্বী...? কমান্ডটা সঠিক শুনলাম কিনা নিশ্চিৎ হতে পারলাম না। পাশের সামরিক লোকটির দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালাম। একই কথার পুনরাবৃত্তি হলো - পরনের প্যান্ট এখানে খুলে রেখে যান।

বলে কী! বেল্ট খুলতে খুলতে খানিকটা ইতস্ততঃ করছি। পাশ থেকে ধমক এলো, কুইক!

ধা করে খশে পড়লো প্যান্টটা। এবার শুধু ছোট্ট একটা বস্ত্রই শরীরে সেঁটে আছে, আন্ডার-অয়্যার!

ভেতরে ঢুকে সামরিক ইউনিফর্ম পরা লোকটির চোখের দিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেলো! স্পষ্ট ইঙ্গিত আমার সবেধন নীলমণি ছোট্ট আন্ডার-অয়্যারটার দিকেই, রিমোভ! !

১৯৮১ সাল। সবে এইচএসসি পাশ করেছি। ব্যায়ামপুষ্ট শরীরে মনে সব কিছুতে একটা ফুরফুরে ডোন্ট কেয়ার ভাব। নিজের সাধারণ ক্ষমতাটুকুকেও বাড়ন্ত তরুণীদের সামনে অতি-বীরত্বে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করার মোহে উঠতি বয়সের উদ্দামতা তখন হার না মানায় উচ্ছল। নতুন পত্তনি করা বাসার সামনে বৃষ্টি-ভেজা শেষ বিকেলের পিচ্ছিল কর্দমাক্ত রাস্তায় সে রকমই এক অতি বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মাথার তালু বরাবর দু' ফাঁক হয়ে যাওয়াটা তখনও টের পাইনি। টের পেলাম, যখন বৃষ্টিতে চুপসে যাওয়া গায়ের লাল গেঞ্জিটা দেখে বোঝার আর উপায় রইলো না যে অরিজিনালি ওটা সাদাই ছিলো!

ঘটনার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় কে কীভাবে কখন মূর্চ্ছা গেলো তা খেয়াল করার হয়তো সুযোগই ছিলো না। হাতের তালু দিয়ে ব্রম্মতালু চেপে ধরে রক্তক্ষরণ থামানোর চেষ্টা চালাতে চালাতে রিক্সা চেপে সোজা সদর হাসপাতালে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণাঞ্চলের নিরিবিলি সুনামগঞ্জ শহরটিতে প্রাইভেট ক্লিনিক বলে এরকম কিছু ছিলো না তখন। সরকারি হাসপাতালটাও জেলখানার সহাবস্থান ছেড়ে সরকারি কলেজের পাশ্ববর্তী এলাকায় ঠাঁই গাড়েনি তখনো।

মাথার দশাসই ব্যান্ডেজ ছেড়ে সেলাইটা তখনো শুকিয়েছে কী শুকায়নি। এডভেঞ্চারপ্রিয় মনে ভূত চাপলো বিমান বাহিনীতেই যোগ দেবো। পত্রিকায় কমিশন র‍্যাঙ্কে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেখে পুরনো ইচ্ছাটা চাগিয়ে উঠায় অন্য কোথাও ভর্তির চেষ্টাও করা হলো না আর। পরিবার থেকে আমার এমন হঠকারি সিদ্ধান্তে পূনর্বিবেচনা করার উপদেশ এলেও আমার গভীর বিশ্বাস ওখানে চান্স তো পাবোই। আমি না পেলে আর পাবেটা কে শুনি! এদিকে খাসিলত কি আর পাল্টায়! ইটিশপিটিশ করার সেনসেটিভ জায়গাগুলোতে মাথা ফাটার প্রাক ও পরবর্তী বিক্রম ফলানোর বীরত্বগাথা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েলী কণ্ঠের কলকলে হাসির মাদকতায় সেই বোধটাই কাজ করেনি যে, এগুলো কি প্রশ্রয়ের হাসি ছিলো? না কি ঝাঁকড়া ঘন বাবরি চুলের উত্তুঙ্গ গ্যালারির মাঝখানে জোড়াতালি চিকিৎসায় ছেটে ফেলাজনিত কেশোচ্ছেদি মধ্যতালুর বিস্তৃত খোলা মাঠ নিয়ে গোপালভাঁড় মার্কা যে অদ্ভুত চেহারাটা ধরেছিলাম, তার প্রভাব? অতঃপর হেয়ার ড্রেসিং সেলুনের স্বচ্ছ আয়নায় ক্ষুরের নির্দয় পোচে পোচে নিজেকে দেখছি! অর্ধমুণ্ডিত চেহারার ভাবগতি দেখে পূর্ণমুণ্ডিত রূপ কী হবে ভাবতেই স্বজন হারানোর মতো দুর্বহ শূন্যতায় কাঁদবো না কি থম ধরে বসে থাকবো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। ক্ষৌরকার লোকটা ছোট্ট তোয়ালেটা এগিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করলো চোখ দু' টো মুছে নিতে। আহা, এক জীবনে মানুষকে কতো কিছুই না হারাতে হয়!

বিমান বাহিনীর ভ্রাম্যমান ক্যাম্প বসলো সিলেট শহরেরই প্রখ্যাত একটা স্কুলে। ভর্তি পরীক্ষার সবগুলো প্রক্রিয়া এখানেই সম্পাদিত হবে, মায় চূড়ান্ত ফলাফল দেয়া সহ। নির্ধারিত দিনে বহু প্রার্থীর সমাগমে গিজগিজ করছে। প্রথম ইভেন্টেই আইকিউ এবং সাধারণ পর পর দু' টো লিখিত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভীড়টা পাতলা হয়ে গেলো। দুপুরের পর পর দু' পর্যায়ের মেডিক্যাল টেস্ট। এগুলো উত্তির্ণ হলে কনফিডেন্সিয়াল

ভাইভা। মেডিক্যাল টেস্টের লাইন ধরেছি। রিটেনে ভালো করায় সিরিয়াল শুরুতেই পড়লো। কিন্তু আগে কি জানতাম কী বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছি! তাহলে হয়তো এই জীবনেও এমুখো হতাম না। নবীন তারুণ্যের তরল আবেগে সেই মেয়েটির কাছে আগপাছ না ভেবে যে অনড় প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তাই এখন গলায় ফাঁস হয়ে গেছে। দেখো, পাইলট হয়ে তোমাকে বিমানে চড়াবোই চড়াবো, নইলে আর কখনোই এ মুখ দেখাতে আসবো না, এই নামটাই পাল্টে দেবো...! স্বেচ্ছাকৃত ছুঁড়ে আসা এই কথাগুলোই কানে বাজতে লাগলো একে একে। অভিজ্ঞতার পাঠে তখন কি আর জানা ছিলো, আত্মবিশ্বাস ভালো কিন্তু অতিবিশ্বাস কিছুতেই নয়?

আমাদের শহরের স্থায়ী কোনো বাসিন্দা নয় সে। মফস্বলের কোন্ দূর গ্রাম থেকে দূরবর্তী আত্মীয়তার সূত্রে এমন মিষ্টি যে মেয়েটা শহরে এসেছিলো ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী হয়ে পাশের বাড়িতে, জান্তে বা অজান্তে কখন যে প্রথম স্বপ্নের মধুবীজটা নিজ হাতেই রোয়ে দিয়েছিলাম বুকে...! দেখতে দেখতে তা চারা হয়ে গেলো! ছায়ার আবেশ নিয়ে বেড়ে উঠছে সে দ্রুত...। শিকড়সহ একে অনাহুত উপড়ানোর অভিশাপ কী করে বইবো আমি...!

এটা কিসের দাগ ! প্রশ্নের ঋণঝণ ধাক্কায় সম্বিৎ পেলাম।

কিন্তু এ কী! আমার আন্ডার-অয়্যার কোথায়! এক আদিম অনার্য পুরুষ আমি দিগম্বর দাঁড়িয়ে ঠায়, নির্বিকার! এক চিলতে সুতোবিহীন এমন মুক্তকচ্ছ মানব হিসেবে এ আমার প্রথম পাঠ, অভূতপূর্ব! সুরমার জলে সাঁতরে সাঁতরে বেড়ে উঠা কৈশোর তারুণ্যে দুর্গময় তেমন কোনো বাথরুম তো ছিলো না যে আগে এমন বিরল অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত হবো? ঘটনার অভিঘাতে তখন পুরোটাই যান্ত্রিক আমি। ভব্যতার লেশমাত্রহীন সামরিক লোক দু' জন আমাকে উল্টে-পাল্টে হাতের স্টিকটা দিয়ে যথেচ্ছ নেড়েচেড়ে কী যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিলো তারাই জানে। আমি শুধু জানি মেডিক্যাল টেস্ট সেরে যে আমি বেরিয়ে এলাম সে অন্য এক আমি, যে এক লাফে অনেক বেশি সাবালক হয়ে গেছে।

চূড়ান্ত ভাইভার কনফিডেন্সিয়ালিটি আমার সেই জন্মদাগটিকেই চিনিয়ে দিলো আবার। এবং বুঝিয়ে দিলো এ দুর্ভাগা দেশে কখনো কখনো এমন সময়ও আসে যখন ঈশ্বর আর আল্লাহর মাঝখানে বিশাল এক ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়! এরপর জীবনে আরো কতো বিচিত্র পরীক্ষা এলো গেলো। কিন্তু সেদিনের সেই নাওয়া-খাওয়াহীন গোটা দিন শেষে এক ক্লান্ত ক্ষুব্ধ ভঙ্গুর বিকেল আমার ভাগ্যটাকে নির্ধারণ করে দিয়ে গেলো, তাঁর সাথে আর কখনোই যে দেখা হবে না আমার! এবং কী আশ্চর্য, আমি চাইলেও সেই মেয়েটির সাথে আর কখনোই দেখা হয়নি!

আগে চুল সরিয়ে দেখতে হতো, এখন আর তার প্রয়োজন হয় না। সময়ের ঝড়ে উড়ে যাওয়া বনানীর মতো ফাঁকা তালুয় চিরুণী ঘষটানোর অভ্যস্ত কৌতুক করতে গিয়ে আয়নার গায়ে একটু খেয়াল করলেই খুব সহজেই লম্বা আড়াআড়ি দাগটা চোখে পড়ে। ভরা কলসীর ধারালো কানা বসে গিয়ে হা হয়ে যাওয়া চামড়ার ভাজ ডাক্তারি সেলাই দিয়ে ফের বুজে দেয়া হলেও এই বুজে দেয়ার অমোচ্য দাগই বলে দেয় ওখানটা একদিন হা হয়ে গিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের সেই কাদম্বিনীর মতোই, আগে যে মরে নাই সে এটা বুঝি মরিয়া প্রমাণ করিল!

সেই দিনটির পর দীর্ঘ সোয়া দুইটা যুগ পেরিয়ে গেছে। আমাদের বাসার গেটে যে কৃষ্ণচূড়ার চারাটা রুয়েছিলাম একদিন, সেটা আজ পূর্ণ বৃক্ষ। প্রতি বছর ফাগুন এলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায় তার। কিন্তু একই সময়ে রোপিত এই বুকের ভেতরের সেই চারাটা এখনো তেমনই রয়ে গেছে! সপ্রাণ সতেজ। এবং বিষণ্নও। ছায়ার আবেশ নিয়ে এখনো বেড়ে উঠতে চায়...!

ব্লগনাম: রণদীপম বসু
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: ranadipam@yahoo.com

সৈয়দ আহমেদ আদনান

সময়ের পরিবর্তন

৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪। রাত তখন পৌনে দশটার মতো। কিছুক্ষণ আগে মোবাইল ফোনের রিঙ্গারটা অফ করে সাইলেন্ট করেছি। আমার ছেলেটার বয়স মাত্র ১৫ দিন। একটু আগেই ঘুমিয়েছে। ফোন বেজে উঠলেই চমকে চমকে উঠছে। রাতের খাবার শেষ করে নিজের ঘরে এসেছি। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি কতগুলো মিস কল, সবগুলোই অপরিচিত নম্বর থেকে। কী মনে করে যেনো কলব্যাক করলাম। ওপাশ থেকে একজন বললো, "আপনি কি মুনিয়ার ভাই?" হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতেই ওপাশ থেকে শুনলাম, "আপনার বোন এ্যাকসিডেন্ট করেছে। ওদের বাসটা নারায়ণগঞ্জের কাছে এক জায়গায় ব্রেকফেল করে খাদে পড়ে গিয়েছিলো।" মুনিয়া কোথায় আছে জানতে চাইলাম। বললো, "চিটাগাং রোডে শুভেচ্ছা মেডিক্যাল ক্লিনিকে।"

ফোনালাপেই ১৫ মিনিট কেটে গেলো। তাড়াতাড়ি করে আমার খুব কাছের বন্ধু আরমানকে কল করলাম। ওর একটা মোটরবাইক আছে, দ্রুত যাওয়া যাবে। আমার বউকে শুধু বললাম, "আমি বেরুচ্ছি, মুনিয়া নাকি এ্যাকসিডেন্ট করেছে!" মা-বাবা কাউকেই কিছু বললাম না।

পৌনে এগারোটার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। ক্লিনিকে গিয়ে দেখি, মুনিয়া ব্যথায় গোঙ্গাচ্ছে আর ডিউটিরত ডাক্তার তার কনুইয়ের কাছে সেলাই করছে। জিজ্ঞেস করলাম, "কী অবস্থা ওর?" বললেন, "সিরিয়াস কোনো চোট লাগেনি, কনুই আর থুতনির নীচে কেটে গিয়েছে, সেলাই করে দিচ্ছি।" পাশের রুমেই ওর আরেক বন্ধুর চিকিৎসা হচ্ছিলো। ওর বড়ভাই নয়ন আমার বন্ধু। ফোনে জানলাম, ও রাস্তায়। প্রসংগতঃ বলে রাখি, নয়ন একজন ডাক্তার। সব শুনে ক্লিনিকের নীচে এসে ভাবছি, এ্যাকসিডেন্টের জায়গাটায় যাবো।

মুনিয়ারা আট বন্ধু মিলে কুমিল্লা গিয়েছিলো ওদের একজনের বোনের বিয়েতে। ওই রাতেই ফিরছিলো। পরদিন দুপুরে ক্লাশ ছিলো। ওদের চারজন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মার্কেটিং বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের স্টুডেন্ট ছিলো। বাকিরা ছিলো কলেজ জীবনের বন্ধু। ওদের পরদিন সকালে ফিরবার কথা ছিলো। ক্লাশের তাগিদ ওদের যাত্রার সময়ের পরিবর্তন করে দিলো।

আরমানকে নিয়ে রওনা দিলাম। কাঁচপুর ব্রীজে উঠতেই নয়নের ফোন, "তোরা এক্ষুনি ফিরে আয়। মুনিয়ার কন্ডিশন ভালো না, ওকে দ্রুত ঢাকায় নিতে হবে।" হঠাৎ কেনো যেনো ভিতরটা ভীষণ ফাঁকা মনে হলো। ফিরতিপথে ঢাকায় এক ডাক্তার বন্ধুকে কল করে এ্যামবুলেন্স খোঁজ করলাম। ও আমাকে "আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম" এর নম্বর দিলো। ওখানে কল করে একটা এ্যামবুলেন্স চাইলাম, লোকেশন বললাম। বললো, "ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।"

ক্লিনিকে ফিরতেই নয়ন বললো, "শিহাব, দেরী করা যাবে না, এক্ষুনি মুভ করতে হবে।" কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম... নীচে নেমে একটা হলুদ ট্যাক্সি পেলাম। ওতে মুনিয়াকে নিয়ে রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। রাস্তায় ক্রমাগত এ্যামবুলেন্সের লোকেশন জানছিলাম। সায়েদাবাদ রেলগেইটটা পার হয়ে মুনিয়াকে এ্যামবুলেন্সে তুললাম। মুখে অক্সিজেন মাস্কটা পড়াতেই বুঝলাম, মুনিয়া নেই।

ক্লিনিক থেকে ফেরার পথে ও ব্যথায় ভীষণ গোঙ্গাচ্ছিলো। ট্যাক্সির পেছনের সীটে আমার কোলের উপরে শুয়েছিলো। আমি ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলছিলাম, "আপু, আল্লাহকে ডাকো।" হঠাৎই যাত্রাবাড়ির কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় ওর মুখে একবার নীচুস্বরে "আল্লাহ্" শুনলাম। এরপর ভীষণ নিরব হয়ে গ্যালো মুনিয়া, কোনো শব্দ নেই। ওর হাত-পা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে গ্যালো। ডাকলাম, "আপু, আপু।"

এ্যামবুলেন্সে করে সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে এলাম। বাসায় জানালাম, "আমি সেন্ট্রাল হাসপাতালে যাচ্ছি।" এমারজেন্সি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওকে পরীক্ষা করে বললো, "I am sorry"। আমি কাঁদতেও

পারছিলাম না। আধা ঘন্টার মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনেরা হাসপাতালে চলে এলো। আমার চারদিকে তখন কান্নাকাটি, মাতম। আমি রিসেপশনের পাশের সিঁড়িতে বসে আছি। ভাবছি, "আমার ফোনটা সাইলেন্ট না করলে হয়তো ওকে বাঁচানো যেতো!"

পরদিন সকালে যথারীতি মুনিয়ার দাফন সম্পন্ন করলাম গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক গোরস্থানে। ওর কবরে মাটি দিয়ে ফিরবার সময় আমার ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে কান্না পেলো। আমার খু-উ-ব আদরের বোন ছিলো ও। সেইদিন থেকে আমার ভেতরে আশ্চর্য হবার অনুভূতিটা হারিয়ে গ্যালো।

মুনিয়া মারা গ্যাছে চার বছরের বেশি হলো। আজও আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে আছে, ফোন সাইলেন্ট করে রাখার।

এই জীবনে আর মুক্তি নেই... ক্ষমা চাইবার সুযোগটাই যে রইলো না আমার জন্য!

ব্লগনাম: বুনো জারুল
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: buno_74@hotmail.com

দময়ন্তী

ছাঁটা ফুলের আসন

দমুকে বললাম দেখ নিজের জীবন থেকে একটা কিছু লিখতে হবে, যা কোনোদিন কাউকে বলা হয়নি। দমু বলল লিখে ফেলো, সমস্যা কী? আমি বললাম না মানে, না বলা কথা। দমু বলল তাতেই বা সমস্যা কী? খুকির গল্প লিখে দাও না। ও গল্প তো কেউ জানে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন খুকি? দমু বলল:

খুকিটা আমি-খুকি হতে পারে, তুমি-খুকি হতে পারে, অথবা সেই-খুকিও হতে পারে। আসলে এই উপমহাদেশে আমি-খুকি, তুমি-খুকি বা সেই-খুকির গল্পগুলো উল্টেপাল্টে এরটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেও খুব একটা ভুল হয় না। কোথায়ও না কোথায়ও গিয়ে সব খুকিদের গল্পগুলোই একইরকম হয়ে যায়।

মনে পড়ল, খুকি যখন ছোট্ট ছিলো, তখন একটু ট্যালা ছিলো। মানে একটু হাবলিমতো আর কী... খুকির দিদা ভারী সুন্দর আসন সেলাই করতেন। কিছু ছিলো এমনি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য, চটের ওপরে ক্রচেট সুতোয় ফুল লতাপাতা আঁকা। আর কিছু ছিলো তোলা-আসন। এগুলো ছিলো ছাঁটা ফুলের আসন। ঐ চটের ওপরেই বোনা হতো উল দিয়ে। তারপর আবার সেই নকশার ওপর কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে দেওয়া হতো। ফলে আসনের ওপরটা পুরো একটা গালিচার মতো চেহারা নিত। তাতে কিন্তু সেলাই আলগা হয়ে খুলে যেতো না। ঐ ক্রসস্টীচে বুনে তারপর ওপরটা ছেঁটে দিয়ে ফাইনাল নকশা ফোটানো হতো। সবটা শেষ হলে পেছনটা লাল টুকটুকে শালু দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো। খুকির ভারী পছন্দ ছিলো এই আসনগুলো। ওকে কেউ ওতে বসতে দিতো না বলেই ওর আরো বেশি বেশি পছন্দ ছিলো। ভাইফোঁটার দিনে মামারা সব, দাদাভাই

আর খোকা বসত লাইন দিয়ে, প্রত্যেকে একেকটা আসনে। মা, মাসিমনি, ছোটদি আর খুকি মাটিতে হাঁটুমুড়ে বসে ফোঁটা দিতো।

প্রথম ছবি

আজ হলো গিয়ে জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠীপুজো। কাগজে লেখে জামাইষষ্ঠী। খুকিদের বাড়ী বলে অরণ্যষষ্ঠী। আজকে মা, মামিরা, মাসিরা, দিদিরা, খুকিরাও আসনে বসে ষষ্ঠী নেবে। মা, মাসিমনি, বড়মামা, বড়মামি, মেজমামা, মেজমামিকে ষষ্ঠী দেবে দিদা। ছোটদি, দাদাভাই, খোকা, খুকিকে ষষ্ঠী দেবে মা, মাসিমনি, মামিরা। খুকি মনে মনে ভারী খুশি হয়। আজ তো আসনে বসার দিন। আজকে ও-ও ঐ গালিচার মতো নরম সুন্দর ঝলমলে রঙের আসনগুলোতে বসবে। বেগুণী, গোলাপী, নীল দিয়ে নকশা করা যেটা, ঐটা নেবে খুকি বসতে। খুকি ওটার দিকে এগোতেই দিদার ধমক - "আরে ধরিস না, ধরিস না... ঐটা ছুঁইস না, ঐটায় বাচ্চু বইব"। খুকি একটু মন খারাপ করে। "ছোটমামা বসবে ওটায়, কেনো বাবা আমি একদিন বসলে কী এমন অসুবিধে হতো ছোটমামার! এইটাই তো সবচেয়ে সুন্দর।" কিন্তু সুন্দর কিংবা অসুন্দর কোনো ছাঁটা ফুলের আসনেই ওকে বসতে দেওয়া হয় না। ওদের জন্য আছে তো ক্রসস্টীচে নকশাকরা চটের আসন। মা, মামিরা, মাসিমনি মাটিতেই বসে, খুকি আর দিদিরা কেউ কেউ ঐ চটের আসনে।

খুকি ভাবে গালিচার মতো আসন মাত্র অল্প কয়েকটা তো, তাই ওদের বসতে দেওয়া হয় না। দিদা তো আরো বানাচ্ছে। সেগুলো শেষ হলেই এক এক করে ওরা বসতে পাবে। দিদা বানিয়ে চলে আর বিড়বিড় করে "অহন আর ভালো দেহি না চক্ষে... কতোটি বাকি আছে অহনও... বাচ্চুর বিয়া আইতাসে... অর লাইগ্যা একটা বানানি লাগব... মুন্নিরও বিয়ার বয়স হইসে... অর জামাইয়ের লাইগ্যাও একখান লাগব... রাজার লাইগ্যা একটা বানানি লাগে... খোকাও বড় হইতাসে..." দিদার বকবকানি চলতে থাকে। খুকি শুনতে থাকে... শুনতেই থাকে। না, ওর নাম উচ্চারিত হয় না... এক আধবার অবশ্য ওর "বর" নামক এক অনির্দিষ্ট কারো কথা শোনা যায়... আবার "সে অনেক দেরী" বলে চাপা পড়ে যায়।

খুকি দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে... শুনতে থাকে... বুঝতে থাকে... খুকি নেই - কোথাও নেই... ঐ সুন্দর রঙচঙে গালিচার মতো দেখতে আসনগুলোর জীবনচক্রে খুকি নেই। খুকির ভেতরটা হঠাৎখালি খালি লাগতে থাকে। ঠিক মন খারাপ নয় কিন্তু। দুঃখ, রাগ ষষ্ঠীর দিন যেমন হয়েছিলো, সেসব কিচ্ছু নয়। শুধু ফাঁকা লাগে।

দ্বিতীয় ছবি

খুকি আর খোকা খেতে বসেছে। দিদার সঙ্গে বড়মামি আসে একটা ছোট্ট খুরিতে দই আর চামচ নিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকে। মা খোকাকে খাইয়ে দিচ্ছে। খোকার ভারী বায়না, মাছ খেতে চায় না কিছুতে। মা ভুলিয়েভালিয়ে খাওয়াচ্ছে। খুকি এমনিতেই চটপট খায়। শেষ করে থালাটা হাত দিয়ে চেটে পরিস্কার করে বড়মামির দিকে তাকায়। কিন্তু বড়মামি তো ওর দিকে তাকাচ্ছেই না। খুকি তাই বলে, "হ্যাঁ এইবারে দাও।" বড়মামিমা হঠাৎই কী রকম অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। মা বলে "আরে ওটা তোর জন্য নয়।" খুকি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে ওঠে, "আমি তো দই খুব ভালোবাসি।" বড়মামিমা অপ্রস্তুতভাবেই "আচ্ছা আচ্ছা" বলে ওর পাতে এক চামচ দই তুলে দেয়। মা খোকার পাতের পাশে জায়গা করে বলে "তুই আর কতক্ষণ দাঁড়াবি বৌদি! এইখানে দিয়া যা গা।" বড়মামি বাকি সমস্ত দইটা খোকার পাতে দিয়ে বাড়ী চলে যায়। পাশাপাশিই বাড়ী ওদের। দিদা কটমট করে খুকির দিকে তাকিয়ে বলে, "এত লোভ কেনো তোর?"

খুকি অবাক হয়ে যায়, ভীষণ অবাক হয়, "অপমানবোধ" নামক অনুভুতিটার সাথে তখনও চেনাজানা হয় নি, তাই বুঝতে পারেনা এরকম লাগছে কেনো? কিরকম যেনো একটা লাগে কানগাল সব গরম, হাত পা ছুঁড়তে ইচ্ছে করছে আবার হাতপা নাড়াতে ইচ্ছে করছে না। এক্ষুণি এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, অথচ উঠে গিয়ে আঁচাতেও ইচ্ছে করছে না। খুকির ভিতরটা হঠাত্ই আবার খালি হয়ে যায়। ফাঁকা হয়ে যায়।

খুকি বড় হতে থাকে আর খুকির পিঠে একটা ডানা গজিয়ে যায় পাতলা ফিনফিনে জলরঙের ডানা, তাতে সোনালী রুপোলি ফুল... খুকি একদিন বড় হয়ে যায়... বড় হয়ে ডানা মেলে উড়ে যায়। "সে" চলতে থাকে...

চলতেই থাকে... পথ শেষ হয় না... ঠ্যাঙাড়ে হীরুরায়ের বটতলা পেরিয়ে, সোনাডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে যে রাস্তাটা চলে এসেছিলো... সে রাস্তার তো শেষ নেই... শেষ থাকতে নেই তার... আমি-খুকি, তুমি-খুকি, সেই-খুকিরা সেই পথ ধরেই চলতে থাকে, যতোদিন না তাদের একজোড়া ফিনফিনে পাতলা ডানা গজায়। খুকিরা জানে, যে জায়গা ছেড়ে আসা যায়, সেখানে আর কখনো, কক্ষণো "ফেরা" যায় না। সেখানে আবার যাওয়া যায়, কিন্তু "ফেরা" যায় না।

ছাদে ইজিচেয়ারে কফি আর বই নিয়ে আয়েস করে বসে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবে... "সে" কোনোদিনই আর ছাঁটা ফুলের আসনে বসেনি, কী এক প্রবল অনীহায় এই আসনবোনার বিশেষ পদ্ধতিটা শেখার চেষ্টাও করেনি। কোনো দুঃখও নেই তার জন্য। খোকার জন্য বানানো আসনটা আছে মায়ের কাছে, ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের জন্য পেতে দেয় মা। একদিন সেটার ছবি তুলে অর্কুটে লাগালো, এক বন্ধু একেবারে মুগ্ধ; জানতে চায় আসনবোনার পদ্ধতি। "সে" চিৎকার করতে চায় "জানিনা, জানিনা, জানিনা, জানতে চাইও না", বলা যায় না। ভদ্রভাবে বলে "জানি না"। বন্ধু খুব দুঃখ করে আগেকার এইসব শিল্পসৃষ্টি সব হারিয়ে যাচ্ছে বলে। "সে" হাসে। এখন বোঝে ওকে আসনে বসতে দেয়নি যে, সে নিজেও কোনোদিন বসেনি নিজের সৃষ্ট ঐ রূপকথার টুকরোগুলোয়। অল্প অল্প হাসি পায়... আসনের চেয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে আরাম অনেক বেশি। করুণা হয়, মায়া হয় দিদার জন্য। তাও কোথায় যেনো একটা তেতো স্বাদ লেগে থাকে... বলা হয়নি, "তুমি জানতেই পারনি, টেরও পাও নি, কতদিন আগে ঐ ছোট্ট লোভগুলো টুপ টুপ করে মরে গেছে, সাথে নিয়ে গেছে তোমার জন্য রাখা ভালোবাসাটুকুও।"

ব্লগনাম: দময়ন্তী
বর্তমান অবস্থান: পুণে, ভারত
ইমেইল: tdamayanti@yahoo.com

মাহবুব আজাদ

না বলার মতো কথা

অনেকেই স্বপ্ন দেখেন না। দিব্যি স্বপ্নহীন নিদ্রিত প্রহর কাটিয়ে উঠে ঘুরে বেড়ান। কিংবা তারা হয়তো স্বপ্ন দেখেন, তা জাগরণের পরপরই বিস্মৃত হয়।

আমি সামান্য তন্দ্রাতেই স্বপ্ন দেখি। বেশির ভাগ স্বপ্নের কথা ভুলেও যাই কিছুক্ষণের মধ্যে, কিছু স্বপ্ন গেঁথে থাকে মাথায়। দুয়েকটা স্বপ্নের কথা মনে করে নিজেই হাসি বার বার, অন্যকেও বলি সেগুলোর কথা।

তবে কিছু কিছু স্বপ্ন চাপ ফেলে মনের মধ্যে। তারা জেগে ওঠার পর মিলিয়ে যায় না, জাগিয়ে তুলে নিজেরাও জেগে বসে থাকে। সেদিন যেমন দেখলাম আমার মা ধাক্কা দিচ্ছেন আমাকে, হিমুবাবা, উঠো, উঠো, সাতটা বাজে, উঠো... আমি কোনো এক অতীত কিশোর হয়ে জেগে উঠি যে ঘরে, তার সাথে স্বপ্নের কিছুই মেলে না। হাউহাউ করে কাঁদি কিছুক্ষণ, আস্তে আস্তে সব আবার ছকে মিলে যায়, আমার কৈশোর, অশ্রু, স্বপ্নের রেশে আমার মা সবই হারিয়ে ফুরিয়ে কাসেলে আমার এখনকার ঘর একটু একটু ফুটে ওঠে অন্ধকারে। স্বপ্নটা কিন্তু দেয়ালে শিশুর হাতের ছাপের মতো বসে থাকে মনে।

তবুও এ স্বপ্ন বলার মতো। বলেছিও অনেককে।

কিছু কিছু স্বপ্ন ভিন্ন রকম কষ্ট দেয়। সেগুলিই বলার মতো নয়। সেগুলি চুপচাপ কোথাও পড়ে পড়ে ধূলো খাবার মতো স্মৃতি।

একদিন যেমন স্বপ্নে দেখলাম আমার প্রথম প্রেমিকাকে, যার সাথে সুদূর অতীতে অত্যন্ত তিক্ত বিচ্ছেদ ঘটেছে নানা কারণে। দেখলাম, তার ঘরে সে মাটিতে বসে আছে হাঁটুতে মুখ রেখে। আমাকে দেখে সে শুধু বললো, কেনো এসেছ তুমি?

ঘুম ভেঙে উঠে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। এমন ঘটনা ঘটেনি কখনো, কিন্তু সব পুরনো তিক্ততা যেনো ঐ একটা বাক্যের মোড়কে ফিরে এলো আবার। অনেকগুলো বছর তো হয়ে গেলো, কতো কিছু ফিকে হয়ে ভোঁতা হয়ে ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও দেখি অনেক কিছু মনে পড়ে আবার। একবার ভাবলাম তাকেই জানাই, আর কাউকে তো এ কথা বলার নেই। পরে মনে হলো, সেই স্বপ্নের কথাটাই যদি শুনতে হয় আবার? ওর ঘরে স্বপ্নেও শান্তিতে হানা দিতে পারলাম না, টেলিফোনে কেনো যাবো? অনেক বছর পর তাই একটা স্বপ্নের জন্য অনেক সময় ধরে আবার কষ্ট পেলাম।

ব্লগনাম: হিমু
বর্তমান অবস্থান: কাসেল, জার্মানি
ইমেইল: royesoye@gmail.com

রায়হান আবীর

কিচ্ছুটি চাইনি

একদিন আমি বুড়ো হয়ে যাবো। তখন আমার ঘাড়ে, পিঠে ব্যাথা থাকবে। তখন আমি ইজি চেয়ারে ইজি হয়ে বসে থাকবো। আচ্ছা ঠিক সেই সময়টায় নিজের জীর্ণ হাতের আংগুলগুলোর দিকে তাকিয়ে কি আমার তোর কথা মনে হবে? হবে হয়তো। মনে হবে এই আঙ্গুল দিয়েই মনিটরের ওপারে বসে থাকা একজনকে জীবনের অনেকগুলো কথা শুনিয়েছিলাম। তার সাথে দুঃখ ভাগাভাগি করেছিলাম - একদম স্বার্থপরের মতো...

কিংবা হয়তো তেমন বুড়ো হবার আগেই আমি পটল ক্ষেতে পৌঁছে যাবো। শুনেছি পটল তোলার আগে জীবনের সব স্মৃতি নাকী একবার উঁকি মারে। তখন যে, তোর কথা আমার মনে হবে - এটা আমি নিশ্চিত।

একসময় ভাবতাম - ইস! আমার যদি ক্যান্সার হতো - আমি যদি হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে বিদঘুটে স্ট্রাইপ ড্রেসটা পড়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তাম। তাহলে তুই আমার বিছানার কাছে আসতি - আমার কপালে হাত দিতি। টেক্সট এর পরিবর্তে আমাকে সত্যি সত্যি আবীর নামে ডাকতি।

মরামরির কথা বাদ। মরামরির কথা তুই ভালো পাসনা এইটা আমি জানি...

আচ্ছা গ্যালারির ওই কোণাটায় বসে তুই আর কতো দিন আমাকে মনে করবি?

অথবা পূর্ণিমা রাতে - যখন তুই এক কাপ কফি হাতে ছাদে যাবি, কাপের কালো কফির উপর সাদা চাঁদটার ছায়া পড়বে, তখন কি তোর মনে হবে না - এই ঘটনাটা তুই একদিন ব্লগে লিখেছিলি - আমার জন্য।

হলো জীবন শুরু হলো - তোকে মিস করবো ভীষণ।

ব্লগনাম: রায়হান আবীর
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: raihan1079@gmail.com

ইশতিয়াক রউফ

ডাম্বো হাতি

কথায় আছে, ঈশ্বরের কাছে বুঝে-শুনে প্রার্থনা করতে হয়। বলা যায় না, কখনো কখনো তিনি প্রার্থনা পূরণ করে দেন। জীবনের আর সব শিক্ষার মতো এটিও ঠেকে শিখেছি।

বহুকাল আগের কথা। তখনও পেটের উপর পর্যন্ত প্যান্ট পড়ি, চুল তেল-চপচপে করে লেপ্টে আঁচড়াই, ইত্যাদি। চিরকালের খেতু আঁতেল আর কী। উঠতি বয়সে এ-ধরণের ছেলেপুলের কাজ একটাই – লেখাপড়া করা। আর সেই কাজের সুফল বলতেও একটাই – বুয়েটে ভর্তি হওয়া। আমার জীবন এই ছাঁচ থেকে খুব একটা ভিন্ন ছিলো না। হঠাৎ করে হাওয়া বদলে গেলো।

"এই ইশতিয়াক, তুমি নাকি চলে যাচ্ছো?"
: আমি? কোথায়?
"দুষ্টামি কোর না, সত্যি করে বল। তুমি কি আসলেই চলে যাচ্ছো?"
: বাহ, ক্লাস শেষ হলে ঘরে যাবো না তো কি তোমার সাথে বসে থাকবো?
"আরে সত্যি করে বলো না, তুমি নাকি আমেরিকা যাচ্ছো?"
: তাই নাকি? জানতাম না তো। কোত্থেকে পেলে এই খবর?

বই প্রচুর পড়লেও সিনেমা-নাটক দেখার অভিজ্ঞতা তেমন ছিলো না। আচমকা এ-উৎপাতে ভড়কে যাওয়া ছাড়া কিছু করতে পারলাম না। পরবর্তী কিছুদিন ধরে এই দৃশ্য অনেক বার পুনর্চিত্রায়ণ হল। পরের দৃশ্য কিছুদিন পর, ক্লাসে। হঠাৎ যেনো আলো-হাওয়া কমে গেলো।

: আরে, ফ্যানটা বন্ধ করলো কে?
"এই ইশতিয়াক, তুমি কী লিখো?
: একটা সাক্ষাৎকারের অনুলিপি লিখি।
"দেখি, দেখি!"
: জ্বালাতন কোর না তো, এক ঘন্টার মধ্যে জমা দিতে হবে এটা।
"আমি লিখবো!"
: (বাকরুদ্ধ(
"কী হল, দাও না!"

আমি কালক্ষেপ না করে নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলাম। সেদিনের মতো ঝামেলা সেখানেই শেষ করা গেলো কোনো রকমে। শান্তিতেই ছিলাম ক' দিন। একটা সময় খেয়াল করলাম বান্ধবীরা সব কেমন যেনো বাকবাকুম করছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম খুবই বিব্রতকর এক সংলাপের কথা। সারসংক্ষেপ অনেকটা এরকম।

"ইশতিয়াক না ডাম্বোর মতো।"
: ডাম্বো? সেটা আবার কী?
"কেনো, তুমি ডাম্বোকে চেনো না? ডাম্বো, ঐ যে, কার্টুনের ঐ হাতিটা।"
: ইশতিয়াক হাতির মতো? মানে?
"আরে, এমন কর কেনো? ডাম্বো কিন্তু খুব সুইট!"

এমন বিধ্বংসী কথোপকথনের পর আমার সামাজিক জীবন খুব স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা বিগড়ে গেলো। এভাবেই চলছিলো। এরপরের পর্ব কোনো এক ল্যাব ক্লাসে। আঁকিবুকি শেষে জিনিসপত্র গোছাচ্ছি, এমন সময় পাশ থেকে সেই কণ্ঠ।

"এই ইশতিয়াক, এটা কী, দেখি? বাহ, তুমি এত যত্ন করে পেনসিল রাখো?"
: ভাইরে, বাক্স নাই দেখে পেনসিলগুলো পলিথিনে করে নিয়ে এসেছি। এতেও কী হলো আবার?

চিরকাল সবাইকে টিপ্পনি কেটে যাওয়া এই আমার দুরবস্থা দেখে কেউ খোঁচা দিতে ছাড়লো না। উস্কানি দিতে একজন বলে উঠলো, তুমি কীভাবে জানলে যে ও সব কিছু যত্ন করে রাখে?

"আরে জানো না, ও ওর ক্যালকুলেটর খুব সুন্দর করে প্যাকেটে ভরে ব্যাগে রাখে।"

উস্কানি আরো এক কাঠি বেড়ে গেলো। এবারে প্রশ্ন, তুমি এটাও দেখেছো?

"আমি সব দেখি!"

এরপরের কিছুদিন আমাকে "আমি সব দেখি" শুনে যেতে হলো বন্ধুমহলে। ততদিনে আমি ক্যাম্পাসের চিপায়-চাপায় বসবাস করা শুরু করে দিয়েছি। কপাল একেই বলে। কেউ চিপায় যায় কপাল খুললে, আমি যেতাম কপাল পুড়লো বলে।

কেউ কেউ এর মধ্যে আমাকে নিয়ে ছড়াও লিখে ফেললো।

*ক্লাসের ভেতর *- পাখি*
যখন আসে-যায়,
কারও কারও চশমার কাঁচ
ঝাপসা হয়ে যায়।

সবাইকে পঁচাতে গেলে
নিজেকেও পঁচতে হয়,
শুধুই সামাজিক না
মাঝে মাঝে সাংসারিকও হতে হয়।

জীবনের সব ক্যালকুলেশন
হয়তো হয় না ভুল,
হাতের রেখা, মনে রেখা
খুব কি বেশি দূর?

এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো একজন এগিয়ে এল।

যত্রতত্র আঁতেল যত-
আজই যেনো নিপাত যায়,
আকাশবাতাস পারবি তোরা-?
কন্যার চোখে ঘুম নিয়ে আয়।

রঙ্গমঞ্চের লীলাখেলা
রসের যতো মিলনমেলা
আজ যেনো সব দূর হয়ে যায়,
আকাশবাতাস পারবি তোরা-?
কন্যার চোখে ঘুম নিয়ে আয়।

কাব্য শুধুই ঝামেলা বাড়ায়
আর কোনো কাজের তো নয়,
আকাশবাতাস পারবি তোরা-?
কন্যার চোখে ঘুম নিয়ে আয়।

এসব হুজ্জতি কারবার আবার চলছিলো ইয়াহু গ্রুপে। একেক রাতে এমন ইমেইল আসে, আর পরের দিনগুলো আমার জন্য আরো কঠিন হয়ে যায়। যখন ভাবতে শুরু করলাম সব থিতু হয়েছে, তখনই নতুন করে শুরু হলো আবার।

"এই ইশতিয়াক, তুমি নাকি হাত দেখতে পারো?"
: হাত? আমি? নাহকে বললো এসব কথা !?
"তুমি জানোদেখে দাও না আমার হাতটা !, প্লিজ। আমার ভাগ্যরেখা দেখে দাও।"

সেবারের মতো এক বন্ধু আমাকে বাঁচাতে এল। বলে দিল, তুমি যতোই চেষ্টা কর না কেনো, বিয়ে তোমার কপালে একটাই; তাও খুব একটা সুবিধার হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাতে থামলো না কিছুই।

“এই ইশতিয়াক, এই!”
: বলো, শুনছি।
“না, বলবো না। আমারদিকে তাকাও।”
: না, তাকাতে পারবো না। হয় তাকাবো, নয় শুনবো। দু’ টার একটা।
“তাহলে তাকাও।”
: না, তাকাতে পারবো না। কান খোলা আছে, তোমার দিকেই দেওয়া আছে। বলো।
“তাকাও না, প্লিইইজ।”
: (মাথা ৪৫ ডিগ্রি মতো ঘুরিয়ে) কী কও।
“(মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে) এই যে এইটা দেখো। আমার হাতটা দেখে দাও না!”
: আরে বাবা, বললাম তো আমি হাত দেখতে পারি না। না, কোনো কিছু বলেই লাভ নেই।
“মনে থাকলো তুমি দেখে দিলে না।”
: রাখো, রাখো। আমারও অনেক কিছু মনে রাখার আছে।

এরপর অল্প কিছুদিনের শান্তি। তারপর আবারও সেই একই জ্বালা।

“এই ইশতিয়াক, তুমি দেখে দিলে না আমার হাতটা? কী হবে দেখে দিলে? প্লিজ, দাও না দেখে !বলো না আমার ভাগ্যরেখাটা কেমন!
: আমার আল্লাহর দোহাইআমি হাত দেখতে পারি না। সিএসই আর ! ইই’ র দুই জন পারে, ওদের কাছে যাও।
“না, তুমি পারো। প্লিজ, দেখে দাও না আমার হাতটা।”
: সব ঠিকঠাক থাকলে তোমার ঘাড় থেকে দুইটা হাত ঝুলছে। দুই হাতে পাঁচটা করে দশটা আঙুল। আঙুলগুলোর নখ কুশ্রী রকম বড়। অস্বাস্থ্যকর!
“তোমার কি মন খারাপ?”
: মানে?
“তোমার মন ভালো হলে কিন্তু আমার হাত দেখে দিতে হবে!”

এটুকুর পরই সেদিনের মতো ভেগেছিলাম। বড় বেশি মূল্য দিয়ে শিখেছিলাম, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। পরবর্তী কিছুদিন কোনো রকমে জান বাঁচিয়ে চললাম। শেষরক্ষা পেলাম আমেরিকায় উড়াল দিয়ে। সেই থেকে বুঝে-শুনে প্রার্থনা করি।

ব্লগনাম: ইশতিয়াক রউফ
বর্তমান অবস্থান: ব্ল্যাক্সবার্গ, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল: ishti.rouf@gmail.com

তুলিরেখা প্রত্যূষা অহনা

ঘরে যাইতে পথ মোর হইলো অফুরান

প্রিয় সুমি,

বহুদিন পরে তোকে চিঠি লিখছি। একসময় এত কাছে কাছে থাকতাম আমরা যে চিঠি লেখার মতন ব্যবধানই ছিলো না। তখন আমাদের সকাল দুপুর বিকেলগুলো ভরে থাকতো নানারকম নতুন নতুন খেলায়, খুনসুটিতে, হাসিখুশি দুষ্টুমিতে। তখন আমরা নবীন চোখে পৃথিবীর সব রঙ সুন্দর দেখতাম, উৎসুক মন দিয়ে টেনে নিতাম সমস্ত রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধমসৃণতারুক্ষ্মতা। তখন আমরা ভরপুর বেঁচে ছিলাম, তখন আমাদের সামনে প্রসারিত ছিলো অচেনা নতুন দিনগুলো। প্রত্যেকটা দিনই তখন নিয়ে আসতো আশ্চর্য সব অভূতপূর্ব উপহার। সবকিছুই নতুন লাগতো তখন। তবু, জীবনের সেই নবীন সকালবেলাতেও আমি আমার সবচেয়ে গভীর বেদনার কথাটি কোনোদিন তোকে বলতে পারিনি। আসলে

সেই কথা আমার নিজেরও মনের উপরে জেগে ছিলো না, ঘুমিয়ে ছিলো গভীর অতলে, যেই অন্ধকার তলদেশের কথা আমি নিজেও জানতাম না। আজ যখন অপ্রত্যাশিত সায়াহ্নের ছায়া পড়লো মধ্যদিনের সবটুকু রোদ শুষে নিয়ে, তখন হঠাৎ জেগে উঠলো সেই ভুলে যাওয়া বেলার বেদনা। এত রক্তঝরা ক্ষত যে ওখানে ঘুমিয়ে ছিলো কে জানতো! সারাজীবন ধরে এই বিষাদের কারুকাজ যে তলায় তলায় বোনা হয়ে চলেছিলো তা আমি কোনোদিন বুঝতে পারিনি।

টলটলে নীল আকাশওয়ালা সুন্দর দিনটি নীলপদ্মের পাপড়ির মতন মহাসময়ের জলে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, ব্যাকুল হৃদয় শুধু চেয়ে আছে আকুল দু' চোখের মণির মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকটা দিনই তো এইভাবে হারিয়ে যায়। কিছুতেই তো ধরে রাখা যায় না! তবু কেনো এই আকুলতা ধরে রাখার? কী মূল্যে তাকে ধরে রাখতে পারি? ধরে রাখার জন্য এই ব্যাকুলতাই বা কেনো? চুমকিওড়না রোদে কমলাগোলাপী সুর লাগে, পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখি মহামহিম সূর্যাস্তের আয়োজন হচ্ছে সেখানে। প্রতিদিন এই অকল্পনীয় অপরূপ আলোর খেলা চলে মেঘে মেঘে বাতাসে জলে গাছের পাতায় পাতায়! আবার কী অবহেলায়ই না সব হারিয়ে যায় কালো রাত্রির নক্ষত্র - উত্তরীয়ের আড়ালে! কোনো ব্যথা বাজে না কোথাও?

সুমি, তুই আমার কথা বুঝবি, আমি জানি। আমরা স্মৃতিসহোদরা, আমাদের বেড়ে ওঠা একই সাথে! আমাদের প্রত্যেক মিল ও অমিলের কথা আমরা জানি! তুই আমার ভাষা বুঝবি, মাত্র এক দশকের দেখা না হওয়া আমাদের সরিয়ে দেয়নি একচুলও। যে খেলার মাঠ আজ আর নেই, যে বিরাট ধানক্ষেত আজ অতীতের গর্ভে, যে শিমূল আর কৃষ্ণচূড়া কবেই কাটা পড়ে গেছে - সেই সবটুকু আজও আছে আমাদের মনে, সেইসব দিন মন থেকে মোছার নয়।

তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব খুব ছোটোবেলা থেকে শুরু। সব খেলায় আমরা একসাথে। অথচ আমাদের ছোটোবেলার ইস্কুল আলাদা, পরে ইস্কুল এক, কিন্তু ক্লাস আলাদা। তুই এক ক্লাস উপরে। তুই গান শিখতিস, আমি কোনোদিন গান শিখিনি। এইসব পার্থক্য আমাদের নজরে পড়ার কথা না তেমন। কারণ আমাদের অনুভবের জগৎ ছিলো এক। তুই জানতিসও না আমি আসলে আমার জীবনের জন্য তোর কাছে কতোটা ঋণী। আমিও জানতাম না। তুই তখন না থাকলে আমার জীবন হতো না-জীবন। হয়তো আমি বেঁচেই থাকতাম না। আমি কিছু বুঝিনি তখন, সেকথা বুঝতে পারলাম অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিয়ে এসে, অর্ধেক জীবন পার করে। এই ঋণ শোধ হবার নয়। পরজীবনে যদি তোকে আবার পাই, হয়তো তখন...

তুই ভাবছিস কথাটা কী, এত বড় গৌরচন্দ্রিকা যার! আসলে কথাটা আমার অবুঝ শৈশবের এক অভিমানক্ষুব্ধ মুহূর্ত, যে মুহূর্তে আমি শুনে ফেলেছিলাম আমি সংসারে অবাঞ্ছিত। আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি লোকসান, আমার জন্য মত্যুই শ্রেয়। তারপরেও কচ্ছপের কামড়ের মতন জেদ নিয়ে আমি কামড়ে ধরে রইলাম জীবনকে, যে জীবন মরণের অধিক মরণ, যেখানে আত্মজাকে অনায়াসে জননী নিজেই দিয়ে দিতে চান মৃত্যুদেবতাকে। আমি মনের তলদেশে সমাধি দিলাম সেই মুহূর্তটুকু, অথবা নিজেই হয়তো সমাধিস্থ হয়ে গেলাম তার মধ্যে। অনেকবার মরণ আমায় ছুঁয়ে গেলো, কোমল হাতে স্পর্শ করে ফিসফিস চৈত্রবাতাসের মতন বলে গেলো - "ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আমায় যখনি ডাকবি, আমি তখনই আসবো।" সত্যিই তো! আমার ভয় কিসের! জীবন যখন এত নিঠুর, মরণই তো আমার কাছে পরম করুণাময়। আর অভিমানও ছিলো না, শুধু মনের বন্ধদরজা এক ঘরের দেয়ালের উপরে মাঝে মাঝে কান পেতেছি - আছে কি এখনও সেই মেয়েটা, সেই অবুঝ শিশুটা, দুনিয়ার উপরে বিশ্বাস নিয়ে জীবন শুরু করতে এসেছিলো যে? হঠাৎ আঘাতে যে বিশ্বাস চিরকালের জন্য ভেঙে গেছে!

সময় আমাদের বড় করলো, প্রস্ফুটিত কৈশোর এলো, এলো অবুঝসবুজ যৌবন। একে একে তোরা সকলে প্রেমে পড়তে থাকলি, তুইও পড়লি একসময়। আমি বন্দী হয়ে আছি সেই অদৃশ্য অমোঘ মৃত্যুবৃত্তে, প্রেম এলেও তাই সাড়া দিতে পারলাম না। তোরা ভাবলি তুলি বড় বড় ভাবনা নিয়ে থাকে, মহাবিশ্ব মহাকাশ, মহাকাল-তাই এইসব ছোটোখাটো সিলি ব্যাপারে তার সময় নেই! আমার আসল কথা বলতে পারিনি, আমি নিজেই যে সেকথা কবর দিয়ে রেখেছিলাম!

সময়ের অমোঘ চক্র ঘুরে চললো। বহুদূর দেশ থেকে আহ্বান এলো, আমি রওনা হলাম খুব অনায়াসে। চিরকাল আমি তো চলেই যেতে চেয়েছি - "যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও, মরণ হে মোর মরণ।" তখন আবার সংসারে আমার দাম অনেক, কিন্তু দাম দিয়ে কেনা ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই তো আমার! আপন সব যে আমার পর হয়ে গেছে সেই অনেক আগের সেই বিষাদসন্ধ্যা-মুহূর্তেই। যদিও সজাগ স্মৃতি থেকে নির্বাসন দিয়েছি তাকে, কিন্তু সেই আমার জীবনের নীল-নকশা বুনে চলেছে।

তোর বিয়ের খবর পরে পেয়েছি, মাত্র আর চারটে মাস দেশে থাকলেই তোর বিয়ে দেখা হতো। তারপরে তোর খবর পেয়েছি নানাজনের কাছে, একবার তো দেশে গিয়ে দেখাও হয়েছিলো আমাদের। সে আজ হয়ে গেলো প্রায় দশ বছর।

বহুদূরের মহাসমুদ্রতীরে অচেনা ডাঙায় জেগে উঠলো সেই কবরে ঘুমিয়ে থাকা স্মৃতি। কী তীব্রতর অভিঘাত নিয়ে! আর মাত্র কিছুদিন সময় আছে জেনে যখন পিছন ফিরে নির্জন একাকী জীবনটাকে দেখলাম, মনে হলো কার উপরে প্রতিশোধ নিতে কেনো আমি ফিরিয়ে দিলাম উন্মুখ ভালোবাসা? কারুর জন্য কিছু কি আমার কর্তব্য ছিলো না? মানুষের উপরে রাগ করে পৃথিবীকে দিলাম না আমার অংশ, যে পৃথিবী পরম মায়ায় জল, বাতাস, অন্ন দিয়ে, অপ্রত্যাশিত ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে আমায় পার করে এনেছে এতখানি কঠিন পথ?

অথচ তুই তো পেরেছিস সুমি! অনাথ-আশ্রম থেকে ছোট্টো অপরাজিতাকে গ্রহণ করে মানুষ করতে পেরেছিস। শুধু তাইই না, সারাজীবন নানাভাবে অর্থ-সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করে আসছিস সেই অনাথ-আশ্রমকে, সংসার-পরিত্যক্ত শিশুদের বাঁচানোর ও মানুষ হতে সাহায্য করার জন্য। এই কাজ তো আমারও ছিলো, আমি তো পারলাম না! এখন আর তো আমার সময় নেই, কিন্তু যতটুকু সম্ভব আমি করতে চাই। আমার সমস্ত সঞ্চয় ওদের দিতে চাই, তুই ব্যবস্থা করে দে। তোর সঙ্গে শীগগীর দেখা হবে, এদিককার সব ঠিকঠাক করে আমি রওনা হচ্ছি মাসখানেক বাদেই।

সুমি, চিরকালের গোপণ কথা একদিন বলে দিতেই হতো, আরো একটা গোপণ স্বপ্নও ছিলো, ঘরে ফেরার স্বপ্ন। পৃথিবী ছাড়িয়ে কোনো অপার্থিব করুণার ঘরে এক মা' কে কল্পনা করতাম, আমার আসল মা, যার কোল থেকে ছিঁড়ে গিয়ে পৃথিবীতে পথ হরিয়ে ঘুরছিলাম। সেই ঘরে ফেরার দিন যতো কাছিয়ে আসছে ততই পৃথিবী যেনো ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে! ঘরে ফেরার পথ দীর্ঘ হয়ে উঠছে, ফেলে আসা জীবনের ছোটো ছোটো সুখ দুঃখ সজল মায়ায় শিশিরের মতন জড়িয়ে যাচ্ছে ডানায়।

ভালো থাকিস সুমি। অপরাজিতাকে স্নেহাশিস। তোদের সঙ্গে দেখা হবে খুব শীগগীর। যতটুকু সাধ্য আছে আমার, ততটুকু করতে চাই। তোদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা।

ইতি,

তুলিরেখা

ব্লগনাম: তুলিরেখা
বর্তমান অবস্থান: হ্যাটিসবার্গ, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল: dhammilla@yahoo.com

অবাঞ্ছিত

বেঈমান দুনিয়া

জন্মাইসি এক্কেরে বাদশাহী (মোড়ের দোকানের পিচ্চি) কপাল নিয়ে। এমনি রসকষ কম, তারউপ্রে চেহারাটা পেঁচায় খাওয়া গোলআলুর মতন। প্রেম কাহাকে বলে চউক্ষে অনেক দেখলেও কোনোদিনই চাইক্ষা দেখা হয় নাই। সারা জীবন বয়েজ স্কুল আর কিছুদিন বয়েজ কলেজে পইড়া আমার তখন মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। প্রেম একখানা করতেই হৈবে... আর কিছু না হৌক, প্রেস্টিজটা তো অটুট থাকবো। অলস সময়ে ঐদিকে আমি "এসো সখী হাত ধরি / ছোট একটা ফুটবল টীম গড়ি" টাইপ কবিতা লেখাও শুরু কইরা দিছি।

বিপুল প্রমিস আর উদ্যম নিয়ে প্রথম ছ্যাঁকাটা খাইলাম। বেক্কলামিটা কই করসিলাম কিছুই উপলব্ধি করতে না পাইরা অভীজ্ঞ একটা তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রেমিক কমিটির শরনাপন্ন হৈলাম আইডিয়ার জন্যে। ওরা আমারে প্রেমের মরা ১০১ কোর্সে ঢুকায়া দীক্ষা দেয়া শুরু করলো। সাপ্তাহিক একটা করে লেসন, বিনিময়ে আমার টিফিন, ইনক্লুডিং মানি। তাও মাইনা নিলাম। প্রথম দুই সপ্তাহে শিখলাম দুই মহাপ্রেমমন্ত্র - "সিমপ্যাথী ওয়ার্কস লাইক এ চার্ম" আর "মানি ক্যান ডু ওয়ান্ডার্ফুল ট্রিক্স।" প্রচুর এক্সাইটমেন্ট থাকলেও দ্বিতীয়টা ঠিক মনঃপুত হইলো না... (অর্বাচিন হৈলে যা হয় আর্কি)। গামছা কাছা দিয়া বাঁইন্ধা লাইগা গেলাম সুচাতুর হিসাব - পরিকল্পনায়। ভাইবা দেখলাম নিজেকে "এজ স্ট্রেইট এজ এ রেইনবো" বইলা দাবি কইরা বিশাল একটা সাময়িক হুলুস্থুলু ফেলে দেয়া যাইতে পারে। তখন মুঠোফোন সূত্রে পরিচিতা কিছু ফ্রেন্ডরা মায়া কইরা হয়তো আমাকে এই ঘোর অনাচার থেকে রক্ষা করতে আগায় আসবে। আমাকে আর শুধুই "ভাইয়ের মতন" কইরা দেখবে না। নিজেরাই আইসা বলবে "আমি তোমার বউয়ের মতন"... আমিও বদখত হাইসা বলবো - "জীবনডা বাচাইলা... শিগগিরই তিনটা চুমা দেও।"

দিগ্বিদিগ আর উড়াইয়া দিতে পারলাম না, এই মাস্টার প্ল্যান কাজে লাগানোর আগেই চৈলা আসলাম যুক্তরাষ্ট্রে। এইখানে সাদা সাদা গাছের উপ্রে রঙিন রঙিন ফল দেইখা তো আমি পুরা টাশকিফাইড! যারে দেখি তারই প্রেমে পইড়া যাই। হার্ট হইতে লাগলো দুর্বল। যা হউক, লং স্টোরি শর্ট - তখন আমার পার্ফরমেন্স প্রায় বাংলাদেশের টেস্ট পার্ফরমেন্সের মতন। প্রায় কারণ বাংলাদেশের তাও দুই একটা অড জয় আছে, আমি পুরাই কনসিসটেন্ট। "ফেইলিওর ইজ দ্যা পিলার অব সাকসেস" হৈলে আমার মাশআল্লাহ বেশ শক্ত মতন হাজারখানেক পিলার হইছে। এক্কেরে এলিফ্যান্ট ব্র্যান্ড সিমেন্ট।

তো এইবার আসি আসল কাহিনীতে, যা লিখতে বসছিলাম। নিশ্চই এতক্ষনে বুইজ্জা গেছেন যে আমি লেখাতেও হোপলেস। আসলে আমার দরকার চোথা। চোথা থাকলে "বাংলার তাজমহল" ও আরেকটা বানায় দিবার পারুম। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে জীবনে কিছুই হইলো না...

একদিন ভর দুপুর বেলা। কামলা দিতেসি এক গ্যাস স্টেশনে। দোকানে কেউ নাই। এক কৃষ্ণাংগ ভদ্রলোকের প্রবেশ। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকায়া ঘুইরা আসলেন কাউন্টারের সামনে। আইসা আমারে কইলেন "আপনার কিছু লাগবে?"

আমি ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না কাউন্টারে বইসা আমার কী লাগতে পারে। তো আমি পাল্টা কইলাম "জ্বী? দোকানে তো সবই আছে। আপনি কোন কোম্পানীর?"

উত্তর আসলো - "না না.. আপনার কিছু লাগবে কিনা?"

এইবার আমি রীতিমত পাজলড .. "যেমন?"

উত্তর যা আসলো সেইটা লিখলে এইটা ছাপার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিলো তাও থাকবো না; শুধু কই যেইটা আমাকে দেওয়ার অফার দিলো ব্যাটা,

পদার্থবিজ্ঞানের সংগা না মানলেও এক ধরনের কাজ কয় উহারে। তো উনি সেই কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রত্যাশী।

আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলে জিগাইলেন "কেনো? সমস্যা কী?"

কী মুসিবত! এ তো দেখি নাছোড়বান্ধা!

উপায় নাই দেইখা ভদ্রভাষায় কইলাম - "হা**র পো গেলি! নাইলে পুলিশ ডাকুম..." আমার এই আকুল কাকুতি শুইনা "হা**র পো" আমাকে মায়া কইরা ছাইড়া দিয়া বাইর হয়া গেলো। মনে মনে কইলাম - "শালার হিন্দিতে চুলের ইয়ার্কি নাকি! কৃষ্ণাংগ ব্যাটার যায়গায় বেটি হইলেও তাও..." দেশি ইংরেজিতে বলতে গেলে লিটলই ডিড আই নো যে কপালের মশকরা এইখানেই শেষ হয় নাই। গোপাল শালা মুচকি মুচকি হাইসা কইতেসিলো "আচ্ছা?"

তো পরের মাসে গেছি এক চাইনিজ বাফেতে খাইতে। হ! আই উইশ! গেছি শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে নিয়ে। আশায় যদি খুশি হয়ে আমার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দেয়... কিয়ের কী... তো আমি দেখলাম বিশেষ সুবিধা হবে না, তাই ক্ষতির পরিমান কমানোর জন্যে সব "নামায়া দিতেসি।"

আমি মন দিয়ে নিজের প্লেটের দিকে তাকায়ে আছি, হঠাৎ সাইড দিয়া দেখি আমগোর পাশের টেবিলে প্রায় শেষ বয়সী যে ভদ্রমহিলা বইসা ছিলেন তার বান্ধবী নিয়া, সেই ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকায়ে একটা স্মিত হাসি দিলেন। আমি সেই হাসির মধুরতর ভার্সন রিটার্ন করলাম। কইরা মনে মনে কইলাম, "আহা কি ভালো মানুষ এরা... আমার বয়সী মেয়েগুলা এমন হইলে..." এইটা মনে করতে করতে শ্বাস ফালাইলাম। শ্বাস ফালাইয়া উইঠা গেলাম আরো খাবার আনতে। দেখি দাদীমাও উঠলেন... ওমা! দাদীমার দেখি গরম লাগে... যা হোক... আমি দৃষ্টি সংযত করে খাবার নিতে যামু, দাদীমা আমার কাছে আইসা আমার হাতে কি জানি গুঁইজা দিলেন। দিয়া কইলেন, "সময় পাইলে ফোন দিও।" বইলাই ফুরুৎ।

জ্বী। দ্যাট ইজ এক্জাক্টলি হোয়াট আই সেড মনে মনে। "ডাব্লিউ টি এফ?" উষ্ঠা খাওয়া কুত্তার মতন আমি কিছুক্ষণ হাঁ কইরা তাকায়া থাকলাম। খাবার নিয়া ফেরত যাওয়ার সময় সুকৌশলে বুড়ির একটা ছবি নেওয়ার চেষ্টা দিসিলাম; পরে দেখলাম একটু মিসপ্লেসড হয়া টেবিলের পায়ার একটা চমৎকার ছবি আসছে। তারপরে দেখি মা বাপে কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টিতে উঁকিঝুঁকি দিতেসে। আমি সুবোধ বালকের মতন আবার খাওয়ায় মন দিলাম।

বুড়ি এখনো বাঁইচা আছে নাকি কে জানে। বুড়ির নাম ঠিকানা লেখা চিরকুটটা আমি অবশ্য রেখে দিসি আমার ডায়রিতে স্টেপল করে। জীবনে এই প্রথম কোনো স্ত্রী লিংগের ব্যক্তিত্ব আমাকে যাইচা ফোন আর ঠিকানা দিলো। কপলের নির্মম মশকরাই সই; তাও দিলো তো কেউ। মাঝেমধ্যে বেশি উদাস উদাস আর একা একা ডায়রি খুলে ভাবি কল দিমু নাকি। ফোন আর দেওয়া হয় নাই। এখন পর্যন্ত শালার বেইমান দুনিয়া বেইমানই আছে। নো অগ্রগতি। এদিকে সময় দ্রুত ফুরায়ে আসতেসে।

পরসমাচার এই যে, আমার দিলের সম্প্রতি কালের একক নায়িকা মর্জিনা সদ্য বিবাহিতা হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া মর্জিনা আমাকে এক আন্ধা নদীতে ফালায় দিয়াছে। আগে খারাপ লাগলে মর্জিনাকে কল দিয়া সুখ দুখের আলাপ করতাম। ইদানিং ফোন্দিলেই তার জামাই ফোন ধইরা মেয়েলি গলায় হ্যালো বইলা কাশি দেয়। আমিও হাঁচি দিয়া ফোন নামায় ফেলি। কি যে বিপাকে আসি... অতি সত্বর একটা বিবাহ করা আমার জরুরী প্রয়োজন। এক মুমূর্ষু সত্তাকে বাঁচানোর জন্য প্রেমের প্রয়োজন। কোনো ভালো বংশের শিক্ষিতা, সুন্দরী, রান্না-বান্না ও গান জানা হৃদয়বতী রমনী দয়াপরবশ হয়ে আমাকে উদ্ধার করতে চাইলে (আছেন কেউ? প্লীজ..?) সত্বর প্রেম নিয়ে হাজির হউন। প্রেম পৌঁছায় দেওয়ার ঠিকানা নিচের বাক্সে দেখেন।

ব্লগনাম: অবাঞ্ছিত
বর্তমান অবস্থান: ওকলাহোমা, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল: samir8002@live.com

রানা মেহের

ঝামেলামানুষ- ৩

অনেক পরে যখন এসেছি শেলফের কাছে তখন বাঁধনের হাতে "প্রজাপতির খামার"। সব ছেঁড়া শেষ। বাকি শুধু চিঠির পাতা। এ বইটা দশদিনের টিফিনের টাকা জমিয়ে কেনা। পাশে পড়ে আছে রেবেকা - ওর্না বলেছিলো তার পড়া শ্রেষ্ঠ বই। দ্য সাইন অভ ফোর। উভচর মানুষ - অদ্ভুত আশ্চর্য একটা গল্প। কর্নেল চুকোভস্কি কল্পতরু - কী স্বাদের সব ছড়া। ডাক্তার সবাইকে দেন ডিম গোলা দুধ ডিম গোলা দুধ ডিম গোলা ডুধ দিয়েই যান।

বাবুকে কিনে দিয়েছিলো সোহেল মামা। আমি আমার কাছে রেখেছিলাম লুকিয়ে। সাথে আরো কতো কতো বই। আমার হীরের টুকরো। সারা পৃথিবীর বিনিময়ে যাদের আমি যেতে দিতাম না।

বাঁধন সব ছিড়েছে লম্বালম্বি তারপর আড়াআড়ি। ছিড়তে পারেনি যেগুলো সেগুলো কালি দিয়ে আঁকানো। আমি আসতেই হাসলো। পা ছড়িয়ে বসলো আবার।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। চেষ্টা করলাম কিছু বাঁচাতে। কোনো একটা প্রথম পাতা উঠে হাতে। বড় বড় করে পুরো নাম ঠিকানা লেখা। নীচে তার থেকেও বড় করে লেখা "বইটি যত্ন করে পড়বেন।"

চোখের পানি মুছতে মুছতে পেলাম সলোমনের গুপ্তধনের প্রচ্ছদ। কালো নীলে কাটাকাটি করা।

আমার বোধ পুরোপুরি লোপ পেয়ে গেলো। বিপদ টের পেয়ে উঠতে যাচ্ছিলো। এক ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিলাম মাটিতে। টেবিলে রাখা ছিলো হলুদ কালো কাঠের স্কেল। পেটাতে থাকলাম আবার উঠতে চাইছিলো। লাথি দিয়ে বসিয়ে দিলাম। আমিও কাঁদছি চিতকার করে। বাঁধনও। কেউ কারো কান্না শুনতে পাচ্ছেনা।

আম্মা এলো রান্নাঘর থেকে দৌড়ে। আমাকে সরানোর চেষ্টা করলেন। একটা থাপ্পড় দিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে চলে এলাম।

রাঙ্গাআপু এসে বললো সবগুলো বই আবার কিনে দেবে। বাঁধনকে গিয়ে বললো যাও। ছোট রাগ করেছে। ছোটকে আদর করে দাও। সে আরো চুপ হয়ে গেলো মায়ের নিষ্ঠুরতায়।

রাতে বাঁধনের খিচুনী উঠলো। যেমন ওঠে নিয়মিত। শরীরের ওপরের অংশ জ্যামিতির চাঁদার মতো বেঁকে গেলো বারবার। পুরো শরীর হয়ে উঠলো বোঝার মতো নিশ্চল। তাকে জড়িয়ে ধরা রাঙ্গা আপুর চোখের পানি মিশে গেলো বাঁধেনর মুখ দিয়ে বের হওয়া ফেনার সাথে।

বাঁধন জানেনা উভচর মানুষ কী। যেমন জানেনা ট্রেজার আইল্যান্ডে লুকিয়ে থাকতে পারে কোনো রহস্য। যেমন আমি জানতামনা এপিলেপ্সি কাকে বলে। কীভাবে একটা মানুষের জীবন ক্রমাগত পড়ে যাওয়া মাথায় আঘাত নিয়ে বেঁচে থাকে।

এবার দেশে গিয়ে দেখলাম অবস্থা ভালো হয়েছে আগের চেয়ে। একটু নড়াচড়া করে। রাগ করে আগের মতো । ছোটভাইয়ের গ্রামার বই হাতে নিয়ে শুয়ে আছে। হাতে কলম। আমি বইটা নিতে চাইলাম। সে শক্ত করে ধরে রাখলো। আরেকটু জোর করতেই বই বালিশের নীচে রেখে ঘুমিয়ে থাকলো তার ওপর। আমি এবার বালিশ ধরে টানলাম। কী করে যেনো বুঝে গেলো এটা খেলা। তারপর আমি বই নিতে চাই, সে হাসে। গলা দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে।

সে কি ক্ষমা করতে পেরেছে আমাকে? কিংবা দয়া করে কি ঈশ্বর তার মস্তিষ্ক থেকে এই স্মৃতি মুছে দিয়েছেন?

বাঁধন, বাবা পৃথিবীর সব বই তোমার হোক। এই সব অর্থহীন বই। অর্থহীন সাহিত্য সব। লেখা দিয়ে কী হয় বাবা যদি না সে একটা কিছু না পাওয়া মানুষের কাজে লাগতে না পারে?

তুমি ভালো থেকো বাঁধন বাবা আমার। আমি কোনোদিন একটা বই লিখলে তার প্রথম কপিটা তোমাকে এনে দেবো। তুমি ছিড়বে অনেকক্ষণ। কাটাকাটি করবে। আমার সাহিত্য অন্তত একজনের কাজে আসুক।

ব্লগনাম: রানা মেহের

মুজিব মেহদী

অকথ্য ব্যক্তিগত

বাসি, মানে এইমাত্র ছাড়া শাড়িতে নাক ডুবিয়ে যেটুকু যৌনগন্ধ নেয়া সম্ভব, আড়ালে সেটুকু নিয়ে উত্তেজনাটাকে একটা বিশেষ মাত্রার তীব্রতায় পৌঁছানো গেলো, ঠিক এরপরেই শুনতে হবে ডাইনিং টেবিলের ডাক, যতোই ক্ষুধা থাক ভাবিনি তা, কেননা এসব ব্যাপার-স্যাপার, যেহেতু বৈধ নয়, খুব দ্রুততালে সেরে নিতে হয়, কখন কে এসে চমকে দেবে কলিং বেল টিপে জানা নেই, আর তাছাড়া এসবে ঝুঁকি থাকে, এবংকি মাঝেসাঝে জান নিয়ে পালানোটা দায় হয়ে পড়ে

আমি কি তেমন খাদক, জোর করে দিতে হবে, যা লাগে আমি নিয়েই নেব, বেশ তো চিংড়ির বড়াটা, আরেকটা নিলাম, আর করলা-ঢেঁড়স ভাজি নিয়েছি তো, শোনো রানটা বরং তুমিই খাবে, আমি গলার হাড়টাসহ অন্য আরেকটা নিলাম, আর ডালটা আমার খুব প্রিয় যেহেতু এখানেই ঢেলে দাও, ইস, শালিক দেখি খাবার টেবিলে, তোমার কি প্রায়ই এমন সইতে হয় নাকি শালিকের উপদ্রব, এই গাছপাড়া তেতলায়

যাহোক তুমি দ্রুত সব গোছগাছ করে আস আমি চুরুটটা টেনে নেই, আর বসো হ্যাঁ, তবে বলি কি, বিশেষ খবরে এনেছ যখন আরেকটু ঘনিষ্ঠে আসো, বিকেল তো আসন্ন প্রায়, গৃহীদের ফেরার সময় হলো, আর একি, তুমি এত নড়চড় কর কেনো, এত বকবক, আর তুমি খুব ভালো সোনা... মনা... ধ্যাৎ কেউ এলো মনে হয়, ঠিক আছে দুয়ার খোলো, বরং আজ উঠি, যা হবার তো হবেই, আর তাছাড়া স্লামালেকুম... হ্যাঁ হ্যাঁ আসি, আর মনে থাকে যেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আসব আবার উনত্রিশে শুক্রবার

ব্লগনাম: মুজিব মেহদী
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: m.mehdy@gmail.com

অতন্দ্র প্রহরী

কাছের মানুষ, দূরের মানুষ

১

হাসপাতাল আমার একদমই পছন্দ না। ফিনাইলের গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে। চারপাশে একগাদা অসুস্থ, অসহায় মানুষ কষ্ট পাচ্ছে ভাবতে গেলে নিজেরই কেমন অসুস্থ লাগে। কারণ মানুষ হিসাবে দুর্বল প্রকৃতির আমি অনেক আগে থেকেই রক্ত যেমন দেখতে পারি না, তেমনি কোনো দুর্ঘটনার গল্পও শুনতে পারি না, এমনকি সুঁই দেখলেও বড়ই অস্বস্তি লাগে। তাই এটা আমার বেশ সৌভাগ্যই বলতে হবে, অনেক ছোটবেলায় হাত ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে একবার একটা অপারেশন ছাড়া আজ পর্যন্ত বড় কোনো সমস্যা নিয়ে কখনই হাসপাতালে যেতে হয়নি আমাকে।

গত বছর বাবাকে হাসপাতালে কাটাতে হলো বেশ কয়েকদিন। বাবা শক্ত ধাতের মানুষ। অপারেশনের আগের যাবতীয় কাজ তিনি নিজেই করলেন, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া থেকে শুরু করে নানান টেস্ট করানো বা অপারেশনের দিন-তারিখ ঠিক করা সহ সবকিছুই। আমাকে কিছুই করতে হয়নি। সাথে যেতেও হয়নি। এমনকি যেদিন অপারেশন হলো, সেদিনও না। অপারেশনের দিন বাবার সাথে মা গিয়েছিলেন, সাথে আমার খালাত ভাই। আমার হাসপাতাল-ভীতির কথা মা জানতেন কি না জানি না, কেনো যেনো তিনিও যাওয়ার জন্য জোর করে কিছু বলেননি। সুযোগ পেয়ে আমিও বাসাতেই থেকে গেলাম। দুপুরের দিকে মা ফোনে জানালেন অপারেশন ভালোভাবেই হয়েছে, জটিলতা ছিলো না কোনো। এরপর কিছু দরকারি জিনিসপত্র নেয়ার জন্য বাসায় আসলেন মা। দুপুর গড়িয়ে বিকালের একটু আগে এবার মা'র সাথে আমিও গেলাম, বাবাকে দেখতে।

হাসপাতালে ঢুকতেই ফিনাইলের কড়া গন্ধের ঝাপটা এসে লাগলো নাকে। নিয়মানুযায়ী স্যান্ডেল খুলে খালি পায়ে ভেতরে গিয়ে রিসেপশনের বাইরে বসলাম। শুনলাম বাবাকে তখনও কেবিনে নেয়া হয়নি, অপারেশন থিয়েটারের বাইরেই একটা ছোট রুমে রাখা হয়েছিলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সেখানে গেলাম। বাবাকে দেখেই চমকে উঠলাম। শক্ত-সমর্থ মানুষটাকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছিলো। চেহারায় সহজাত কঠিন ভাবটা উধাও, সেখানে ক্লান্তির ছাপ। হাতে স্যালাইনের সূঁই ঢোকানো। কী বলব কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাবা নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছি। বেশি কথা বলার সুযোগ হলো না। সাদা পোশাক পরিহিতা এক নার্স এসে জানালেন উপরে কেবিন রেডি, বাবাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিয়ে এরপর আমি বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

মা আমাকে উপরে গিয়ে কেবিনটা দেখতে বললেন। তাঁকে নিচে বাবার কাছে রেখে আমি উপরে দেখতে গেলাম কেবিন ঠিকঠাক আছে কি না। সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়েই বুঝলাম আমার খারাপ লাগা শুরু হয়ে গেছে। এর আগেও দু' একবার অসুস্থ বন্ধুদের দেখতে হাসপাতালে গিয়েছি, কিন্তু কখনই এতটা সময় থাকিনি। মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁকা লাগছিলো, গলার কাছে মনে হচ্ছিলো কী যেনো পাকিয়ে আছে, আর বাকি শরীরের ওজনও যেনো বেড়ে গেছে বহুগুণ। এক নজরে আশেপাশে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। জোরে শ্বাস নিয়ে ঝিম ধরা ভাব কাটানোর চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না তেমন একটা।

একটু খুঁজতেই, দুইএকজনকে জিজ্ঞেস করে কেবিনটা পেয়ে গেলাম। ততক্ষণে আমার খারাপ লাগা আরো অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। বাবাকে তখনও আনা হয়নি। দেরির কারণ না জানলেও, আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম বিরক্তির সাথে। মুহূর্তগুলো মনে হচ্ছিলো যেনো অনেক লম্বা। অস্থির হয়ে খালি কেবিনের ভেতরে-বাইরে পায়চারি করছিলাম। বেশ অনেকক্ষণ পর যখন বাবাকে কেবিনে নিয়ে আসা হলো, তখন আমার অবস্থা খারাপের চূড়ান্ত। মনে হচ্ছিলো আর কিছুক্ষণ থাকলে, রোগী হয়ে আমাকেই থেকে যেতে হবে হাসপাতালে। বাবাকে বিছানায় শোয়ানো পর্যন্ত

অপেক্ষা করলাম কিছুটা জোর করেই। এরপর কোনোরকমে বিদায় নিয়ে, বাবা-মা' র চোখে হালকা প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টি রেখে, বলতে গেলে একরকম পালিয়েই চলে আসলাম সেখান থেকে।

হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে স্বাভাবিক হতে বেশ অনেকটা সময় লাগলো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক অনেকক্ষণ হেঁটেওছিলাম। এদিক-ওদিক ঘুরে বাসায় ফিরেছিলাম সেদিন অনেক রাতে। খুবই খারাপ লাগছিলো। নিজের জন্য না, খারাপ লাগছিলো বাবার জন্য। ছেলে হিসাবে আমার উচিত ছিলো তার পাশে থাকা। কিন্তু আমি থাকিনি, বা থাকতে পারিনি। আমি সেদিন পালিয়ে চলে এসেছিলাম। শুধু তাই নয়, বাকি যে ক' টা দিন বাবা হাসপাতালে ছিলেন, আমি আর ফিরে যাইনি একদিনের জন্যও।

২

বাবার সাথে আমার বিস্তর দূরত্ব। বোঝার মতো বয়স হবার পর থেকে কেবলই মনে হয়েছে - এ দূরত্ব শুধু অস্পৃশ্যই নয়, অনতিক্রম্যও। শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো থেকেই বাবাকে দেখে এসেছি খুব রাগী, জেদী, কঠোর নিয়মানুবর্তী, এবং মিতভাষী হিসাবে। প্রচন্ড ভয় পেতাম তাঁকে। শুধু আমিই না, আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে আমার বন্ধুরা বা পরিচিত মানুষজন পর্যন্ত তাঁকে খুব সমীহ করে চলত। তাঁর শাসনের বেড়াজালে বেড়ে ওঠার সময়কালে যতোই আঁকড়ে ধরতে গেছেন তিনি আমাকে, মুঠোয় ভরা বালুর মতো ফাঁক গলে ততই স্পর্শের বাইরে চলে গেছি। এরপর সময় যতো গড়িয়েছে, কখন যে পরস্পরের এত দূরে চলে গেছি, টেরও পাইনি। দিনে দিনে নির্লিপ্ততা রপ্ত করেছি, চেহারায় ভালোবাসাটাও হয়তো আরো পাথুরে হয়েছে। কিন্তু সেদিনের সেই আপাত দৃষ্টিতে ছোট্ট ঘটনাটা আমাকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। অনেক ভেবে ভেবে সেদিন আমি প্রথম সত্যের আগে উপলব্ধি করলাম দ্বিতীয়টা, মাঝের দূরত্ব না হয় না-ই অতিক্রম করতে পারি, না হয় না-ই প্রকাশ করতে পারি নিজেকে বাবার কাছে, কিন্তু তাঁকে যে খুব দূরের মানুষ ভাবতাম, বড্ড ভুল ভাবতাম। আসলে কোনো কোনো মানুষ এতটাই কাছের যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না, বরং দূরে গেলেই তার অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

প্রতিদিন অসংখ্য ভুল করতে করতে, ভুলের মিছিলে এমনভাবে মিশে গিয়েছি যে, এটা আর ভাবায় না আজকাল খুব একটা। তাই একটা ভুলের উপলব্ধি করার পরেও, সেটার প্রকাশ না ঘটিয়ে আরো বড় ভুল যে প্রতিটা দিন করেই যাচ্ছি, সে উপলব্ধি যে কবে হবে, জানি না। হয়তো কখনই বাবার পাশে বসে তাঁর হাত ধরে বলা হবে না সেই দিনগুলিতে কেনো তাঁর পাশে থাকতে পারিনি। বলা হবে না সেদিনকার সেই পালিয়ে আসা আমার জন্য কতোটা কষ্টের ছিলো, যে কারণে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারিনি দীর্ঘদিন। হয়তো বলার সুযোগ হবে না কখনো; অথবা হয়তো হবে, কিন্তু বলব না। শুধু ভুলের বোঝা বাড়িয়েই যাব এভাবে, প্রতিটা দিন, বাড়িয়ে যাব দুরত্ব।

৩

কোথাও পড়েছিলাম, অপরাধবোধ না গ্লানিতে ভোগে ক্ষুদ্র মানুষরা, তখনই - যখন তারা তাদের ভুল আচরণের জন্য কোনো অজুহাত খুঁজে পায় না। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, ভুলও করি প্রচুর। তবে আমার ভেতর কোনো অপরাধবোধ কাজ করে না। গ্লানিতেও আমি ভুগি না। শুধু মাঝে মাঝে প্রবল এক অসহায়বোধে আচ্ছন্ন হই, মানুষ হিসাবে নিজের ক্ষুদ্রতা বা সীমাবদ্ধতাটুকু জয় করতে না পারার জন্য।

ব্লগনাম: অতন্দ্র প্রহরী
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ

নিঝুম মজুমদার

মিলন স্যার

স্যারর...আপনাকে

এই চিঠিটি আমার লেখার কথা ছিলো আজ থেকে বারো বছর আগে। ভয়, সাহসের অভাব, কী লিখব এই জাতীয় জটিলতা থেকে আর লিখা হয়নি। আমার বাবা আমাদের শেষ তিন ভাই বোনকে শুধু পড়ানোর জন্য টিচার রাখতেন না। "হাড্ডি-চামড়া" ভাগাভাগি ছিলো মূল উদ্দেশ্য । এই চুক্তিতেই টিচাররা চড়া বেতনে নিয়োগ পেতেন। আহা... কতো যে মার খেয়েছি সেই সময়! একটি পর্যায়ে সকল অত্যাচারের থেকে মুক্তি পেতে বাধ্য হয়েই আমরা তিন ভাই-বোন মিলে একটি দল গঠন করি। ট্রিপল বাহিনী। কতো গল্প যে আছে। তার শেষ নেই। আজকে অনেকদিন পর পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে গেলো। না বলা অনেক কথা বলে ফেললাম। সাহস পেয়েই...

এলাহী ভরসা ৭৮৬

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

স্যারর, আমার এই চিঠি আপনার কাছে সম্ভবত পৌঁছাবে না। এই আশাতেই লিখি। বারো বছর আগে বাবা আপনাকে যখন ড্রয়িং রুমে বসে রিক্রুট করছিলো আমাদেরকে পিটানোর জন্য আর তার ফাঁকে ফাঁকে পড়ানোর জন্য আমরা তখন ঘরের চিপা-চাপা দিয়ে আপনাকে ভালো করে মেপে নিচ্ছিলাম। বাবার সাথে আপনি যখন "চামড়া বাবার আর হাড্ডি আপনার" ডিল করছিলেন তখন... স্যার কিছু মনে করবেন না, আপনাকে মানুষ মনে হয়নি। মনে হয়েছে সাক্ষাত খাটাশ। যে কিনা রাত বিরেতে ঠাশ ঠাশ করে হাসে। মানুষের দাঁত থাকে বত্রিশটা। আমার, ছোট ভাই নিলিম আর ছোট বোন দোয়েল, আমাদের তিন জনেরই ধারনা হয়েছিলো আপনার দাঁত বেয়াল্লিশটা। হবেই না কেনো, আপনি তো স্যার মানুষরূপী খাটাশ ছিলেন। আমাদের বাসায় যে মুগুরটা ছোট চাচা রাস্তার কুকুর কে তাড়ান দেয়ার জন্য রেখেছিলো, সে সময় মনে হচ্ছিলো তা দিয়ে আপনার দাঁতগুলো একটা একটা করে ভাঙ্গি। কিন্তু আফসোস, মুগুরটা অত্যন্ত ভারী থাকায় এবং ছোট ভাই ও ছোট বোন সাহস করে উঠতে না পারায় (আমারো সাহস হয়নি যদিও..) আর নেহায়েত আমার স্বাস্থ্যটা দাস্ত জনিত উপসর্গের কারনে খারাপ থাকায় আপনাকে ওইদিনই কোনো ট্রিটমেন্ট দিতে পারিনি।

প্রথম দিন আপনাকে তৈল ট্রিটমেন্ট দেবার জন্য, ছোট ভাই এবং ছোট বোন দ্বারা গঠিত আমাদের ট্রিপল বাহিনীর পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। স্যার আপনি হয়তো জানতেন না আপনার আসার আগে গোটা পনেরো স্যার, ম্যাডাম আমাদের ট্রিপল বাহিনীকে পড়াতে এসে পটল তোলার কায়দা কানুন প্রায় শিখে গিয়েছিলেন। আপনি হয়তো শরীরের দিক থেকে একটু জাস্তি ছিলেন। তাই আপনার সাথে পেরে উঠতে খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিলো। ওই যে শুরুতেই বলেছিলাম আপনি ছিলেন খাটাশ। এতদিন সব মানুষগুলকে শায়েস্তা করতে করতে খাটাশ শায়েস্তা করার নিয়ম কানুন কিছুই শিখা হয়নি। বাদ দেন সেসব কথা। তৈল ট্রিটমেন্টটা খারাপ ছিলো না। আপনার কাজ ছিলো কান ধরে টানা টানি করা। তাই কানে একটু সরিষার তৈল দিয়ে এসেছিলাম। আপনি যেহেতু বলদ শ্রেণীর ছিলেন, তাই হয়তো বুঝতে পারেন নাই। যাই হোক চেয়ার থেকে পড়ে, এবং ভয়াবহ বিস্মিত হয়েই আপনি আমাকে "তুমি" থেকে "তুই" সম্বোধন করেছিলেন। যা ছিলো আমার ব্যাক্তিত্বের উপর প্রচন্ড আঘাত। এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, সে কারনেই আপনাকে জামাল গোটা ট্রিটমেন্টে

দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এটা আমার একার সিদ্ধান্ত না, আমাদের ট্রিপল বাহিনীর পর পর তিনবারের বৈঠকের সিদ্ধান্ত ছিলো। ছোট বোন দোয়েল খানিকটা সরল সোজা হওয়ায় এবং তার অনুরোধ রাখতে গিয়ে একটা বড়ির উপর দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য তার পরের কথা ভিন্ন। আপনি যেনো কিভাবে টের পেয়ে গিয়েছিলেন এইটা আমাদের কাজ। মনে আছে স্যার কি মারটা না আপনি আমাদের মেরেছিলেন? পাছার উপর সে কী অত্যাচার! দলের ক্যাপ্টেন হবার সুবাদে আপনি আমাকে যেই নির্যাতন করেছিলেন, এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে এই বলে কতো অভিশাপ দিয়েছিলাম যেনো এটলিস্ট এক সপ্তাহের জন্য আপনার হাগা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ শুনে নাই সে কথা । তাতে কী? হাশরের ময়দানে পার পাবেন না ইনশাল্লাহ ।

যাক স্যার, একটা সময় আপনি আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে প্যাঁচ লাগিয়ে আমাদের ট্রিপল বাহিনীর যেই ক্ষতি করেছিলেন যে আমরা একজন আরেকজনকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পুরা বিএনপি' র মতো অবস্থা। স্যার আপনাকে প্রথমে আমরা তিনজনই ভেবেছিলাম খাটাশ। মূল ঘটনা হলো আপনি স্যার আসলে শিয়ালের মতো বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। পুরা মইন ইউ সরকার। আজ বলতে দ্বিধা নাই।

আজকে আপনাকে একটা সত্য কথা বলি, আপনার এক্সপায়ারি ডেটের শেষ তিনমাস, আপনি আসলে একঘন্টা আগে চলে যেতেন। কেননা, আপনি জানতেন না আপনি বাথরুমে গেলে আমরা আপনার ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিতাম। একটু আগে যে বললাম আপনি শিয়াল পন্ডিত, আসলে তা ছিলো ভুল। আপনি একটা উন্নত জাতের গাভী। গরুও না। আপনার অদৃশ্য লেজটা যে কোথায় লুকিয়ে রাখতেন! আপনার স্যার এলেম আছে। আপনি পড়ানোর পরে আমরা নিজেদের ক্রেডিটে অঙ্কে পাশ করেছিলাম। অথচ বাবার কাছে ক্রেডিটটা নিতেন আপনি। আর বাবা পাশে দিয়ে গেলে তাকে খুশি করার জন্য আপনি আমাদের পিটাতেন। স্যার... খাটাশ, শিয়াল এবং গাভীর পাশাপাশি আপনার আরেকটা নিক হলো, মহিষ। আপনি স্যার মহেশ গল্পটা পড়াতে গিয়ে সব সময় বলতেন মহিষ। বলবেনই তো, আপনি নিজেই যা বলবেনও তা। আপনার মনে আছে, আপনি পড়াতে এসেই আপনার বিকট দুর্গন্ধযুক্ত মোজাজোড়া খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখতেন? আর আপনাকে যখন নাস্তা দেয়া হতো, আপনি বিস্কিটগুলো খাবার পর আপনার আঙ্গুল মুখে দিয়ে সেই বিস্কিটের লালা আবার চেটে-পুটে খেতেন। আর চা খেতেন হুশ-হুশ জাতীয় বিকট শব্দ করে। আপনি স্যার আসলে একটা প্রথম শ্রেণীর খচ্চর ছিলেন। জানিনা এখন মহিলা কলেজে আপনি কী করে পড়ান। (ভালো কথা, আপনার হাওয়া ভবনের বদঅভ্যাসটা কি এখনো আছে?) জলি নামে যেই মেয়েটিকে আপনি প্রেমপত্র লিখতেন সেখানে আপনি যে কতো বানান ভুল করতেন! একটা শুধু ধরিয়ে দেই। আপনি লিখতেন, "ফ্রিয় জলি"। আর আপনাকে পামপট্টি দেবার জন্য জলি নামের অত্যন্ত কুতসিত ডাইনীকে অনেকবার জুহিচাওলার সাথে তুলনা করেছিলাম। তার জন্য জুহির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে স্যার জলি ম্যাডাম ছিলো একটা উইচ। মানে জানেন তো? মানে হচ্ছে ডাইনী। তবে দোয়া করি উনি যেনো আরো উঁচু শ্রেণীর খাটাশীনি হন। তাতে করে আমাদেরকে টর্চার করার মজাটা বুঝবেন।

স্যার বলতে লজ্জা লাগে তারপরেও বলি, আপনি অঙ্ক শিখানোর পর আমরা আর অংকে ফেল করি নাই। যদিও আপনি আমাদের পপি গাইড থেকে অংক করাতেন। বুঝতে পারছিনা আপনার মতো এই জাতীয় ব্যাক্তি প্রশংশা নিতে পারবে কিনা। একবার আপনার ড্রেস আপের প্রশংসা করার কারনে, "তোরে জিগাইসি?" বলে একটা চড় দিয়েছিলেন। আপনার দেয়া সেই চড়ের কারনে বারো বছর পর আজো এই বিদেশ বিভুঁইয়ে বাম দিকে ফিরে শুতে পারিনা। হাত তো না যেনো মুগুর। যাক, আল্লাহ বিচার করবে এই সকল অত্যাচারের। আপনার কি জাপান প্রীতি এখনো আছে? মনে আছে স্যার, আপনি যাই পরে আসতেন, তাই কোনো না কোনো ভাবে জাপান থেকে আমদানীকৃত ছিলো? জাপানী বাবাজীদের প্রতি আপনার এই অনুরাগ আজো ভেবে বের করতে পারি না।

তবে স্যার, শেষ কথা হলো, আপনি চলে যাবার পর আমরা ট্রিপল বাহিনীর সকল সদস্য কোনো এক অজ্ঞাত কারনে আপনাকে খুব মিস করেছিলাম। বুঝতে পারিনাই কেনো। মানুষ বড় অদ্ভুত প্রাণী। আপনার মতো খাটাশেকেও যে কেনো মিস করতাম! যাই হোক, ভালো থাকবেন।

আর ভালো কথা... ফ্রিয় জলি ম্যাডাম আপনার সাথে আছে? না খাটাশে-খাটাশে কাটাকাটি?

ইতি,

আপনার গুণ!মুগ্ধ

ট্রিপল বাহিনীর পক্ষ থেকে

ক্যাপ্টেন নিঝুম

পুনশ্চঃ

স্যার, আপনি কি এখনও মুখে অঙ্গুলি চালনা করে বিস্কিট চোষেন?

ব্লগনাম: নিঝুম
বর্তমান অবস্থান: লন্ডন, যুক্তরাজ্য
ইমেইল: blessfulhell@hotmail.com

অম্লান অভি

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখ না মনে...

৩১/০১/০৯ আজ সরস্বতী পুজা। কাল বিশ্ব ইজতেমা'র আখেরী মুনাজাত। আজ আমার মাস্থলি শেষ দিনের আর কয়েক ঘন্টা বাকি এই নেট লাইন ব্যবহারের। দিন দু' য়েক নেট বিচ্ছিন্ন থাকব। কিন্তু এই পড়ন্ত সময়ে সচলায়তনে এসে আবার চোখ কাড়লো ষ্টিকি লাইনটি - "নতুন ই-বুক: আজ লেখা পাঠানোর শেষ দিন।"

যেদিন জানলাম বিশ পূরণ হয়েছে তার আগেই বিশ্বাস ছিলো ২০ সংখ্যাটি এমন যে আহ্বানে সাড়া দিলেই পূরণ হবে; সচলদের এই বিশাল মন্তব্যের বহর দেখেই। তাই গোপনেরে গোপনেই রেখেছিলাম। তবে এই শেষ সময়ে এসে এক গোপনকে জানাতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে। একদমই নতুন গোপন কথা - নাইজেরিয়ান লাভের ধারা এখন www.sachalayatan.com এও... আমি আজ একটা ইমেইল পেলাম। প্রেরক Pauline Tajia Dontel, সময় Saturday, January 31, 2009 7:03 AM, বিষয় Happy Weekend আর পূর্ণাঙ্গ ইমেইলটা হচ্ছে:

Hello,

Compliment of the season, my name miss Pauline. I saw your profile today on (http://www.sachalayatan.com) and it really attract me a lot I believe that you are the man I have been looking for to share my love with, whom will love me love and happiness my heart is missing for long. How is your health? I hope all is well with you. I believe that we can move from here, but remember that age or color does not matter what matters is the true love and understanding, honest, I hope you read from you my address. I shall include my picture once I get your email address, I been waiting for your reply mail me with this mail address for further introduction.

Thanks hope to hear from you soon.

আমার জানা নেই Pauline নামে কোনো সদস্য আছে কিনা সচলায়তনে! এই বিদেশীর ছবি পাব এই আশায় ইমেইল এ্যাডটি গোপন রাখলাম, তা নয়। একটি শ্রদ্ধাবোধে, যে আমার সচলায়তনের প্রোফাইলের তথ্য যেহেতু বাংলায় লেখা তাই এই বিদেশী নাম্মী বাংলাও

জানে। হয়তো ‘র’ ঠাকুরের শিরোনামের লাইন তার জানা। ধন্যবাদ Pauline Tajia Dontel তুমি হেদায়েত করলে আমায় - গোপন কথা পড়ার পাঠক' কে তথ্য দিতে পারায়।

আমার প্রিয়ার কিসের কথা লিখলে পরেও দেখানো যাবে না

কিন্তু আমার ভাবী প্রিয়ার গোপন কথা গোপন রইলো না।

ব্লগনাম: অম্লান অভি
বর্তমান অবস্থান: পাবনা, বাংলাদেশ
ইমেইল: Amlan43@yahoo.com

মৃদুল আহমেদ

কেমন আছো রোজালিন?

আমি যে তার নামটাই ভুলে গেছি!

না না, মনে পড়েছে। রোজালিন। তার নাম রোজালিন।

সম্ভবত সেই আমার জীবনের প্রথম প্রেম। ফাজলামি নয়, সত্যি সত্যি। কিন্তু প্রেমটা সেই এক তরফাই। আমি দূর থেকে তার প্রেমে পড়েছি, সে জানে নি।

আসলে আমিও কিন্তু টের পাই নি। আমি যে তার প্রেমে পড়েছিলাম, সেটা অনুভব করলাম সে চলে যাওয়ার পর। যেদিন আমাদের পাশের ভাড়া বাসা ছেড়ে তারা চলে গেলো নিজেদের তৈরি হওয়া নতুন বাসায়। তারপর আর যোগাযোগ হলো না কোনোদিন। এমনই গাধা আমি, তারা যখন বিদায় নিতে এলো আমাদের বাসায়, লজ্জা ভেঙ্গে ঠিকানাটা চাইতে পারলাম না একবারও।

স্মৃতি আসলেই বড় অদ্ভুত। এত অনুভূতি একদিন যাকে ঘিরে ছিলো, আজ তার নামটাও মনে করতে হয় চেষ্টা করে।

অবশ্য তার আর আমার মধ্যে সামাজিক অবস্থানের যে দূরত্ব, সেটা ঘোচানো বড় কঠিন ছিলো।

তারা বিদেশ ফেরতা, পাশে দাঁড়ালেই সবসময় বিদেশি পারফিউমের গন্ধ টের পাই। অনেক কিছু জানে রোজালিন, অনেক ধরনের হ্যান্ডিক্র্যাফট বানানো, কাগজ দিয়েই কতো কিছু তৈরি করে ফেলতে পারে মুহূর্তে। আর আমি সেই তুলনায় একটা গাধা টাইপ আনস্মার্ট ছেলে। পারফিউম ব্যবহার করাই শিখি নি। পারফিউমকে তখন বলতাম “সেন্ট”, মায়ের বা বড় বোনের “সেন্ট”টা মাঝেমধ্যে চামেচিকনে শার্টে স্প্রে করে ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াই, কিছু গল্পের বই পড়া ছাড়া আর কিছুই অর্জনে নেই হাতে।

তাদের নিজেদের বাড়ি তৈরি হচ্ছিলো বলে ভাড়া বাড়িতে ওঠার কারণেই তাদের সান্নিধ্যে আসতে পারা, নইলে রোজালিনের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো সুযোগ আমার ঘটত না কিছুতেই।

রোজালিন। হ্যাঁ, নামটা উচ্চারণের সাথে সাথেই আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যেতে শুরু করেছে, স্মৃতি থেকে উড়ে আসছে একের পর এক ঝকঝকে সাদা মেঘ, পেঁজা তুলোর ছোঁয়ার মতো আদরের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে আমার সারা শরীরে। আমি আবার জেগে উঠছি, আবার ফিরে যাচ্ছি সেই সময়ে, উদাস হাওয়ার গন্ধমাখা সেই দিনগুলোতে, যখন দিনশেষে সন্ধ্যার আকাশে ডিমের কুসুমফাটা লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ত আর মুগ্ধ করে দিতো, স্তব্ধ করে দিতো আমাকে। যখন ঝিম ধরা দুপুরে ইস্টিশন থেকে ভেসে আসা ইঞ্জিন সান্টিংয়ের ধিকিধিকি আওয়াজটা উদাস করে দিতো, মনে হতো সারাটা পৃথিবী যেনো একটা করুণ আবেগে কাঁপছে। তামাটে রঙা আকাশে ডানা মেলে ধীর

গতিতে ওড়া চিলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভেতর থেকে কেমন একটা হাহাকার উঠে আসতো, মনে হতো কোথায় কারা যেনো অপেক্ষা করে আছে, কতো কী যে বলার আছে তাদের, তারা যেনো আমার কতো দিনের বন্ধু, কতো আদিগন্ত জোড়া মাঠ, হুহু করে বাতাস বয়ে যাওয়া ধানক্ষেত, নদীর পাশে বালুচরের এক কোণে জমে থাকা এতটুকু টলটলে জল... তারা অপেক্ষা করে আছে আর ডাকছে আমায়।

সেই সময়েই তো আমার জীবনে এসেছিলো রোজালিন। খুব বেশিদিনের জন্য নয়। আবার খুব কম দিনও নয়।

তার সাথে আমার অনেকটা সময়ই কেটেছে। অনেক শীত শীত সকাল, ঝিম ধরা দুপুর, রোদ ঝলমলে বিকেল কিংবা টিপটিপ তারাজ্বলা সন্ধ্যা। কিন্তু কখনো মনে হয়নি, আমি তাকে ভালোবেসেছি। তার প্রেমে পড়েছি।

সত্যিকার প্রেম বোধহয় এমনই হয়। "এই যে আমি প্রেমে পড়লাম" এমনটা ভেবে কোনো সত্যিকার সম্পর্ক হয় না কখনো। তার আমার ঘনিষ্ঠতা সাধারণ বন্ধুত্ব হিসেবেই দেখেছিলো আমাদের দুই পরিবার। সত্যি সত্যিও সাধারণ বন্ধুত্বই ছিলো সেটা। তার অসাধারণত্ব বোঝা গিয়েছিলো, যখন সে আর হাতের কাছেও ছিলো না, নাগালেও না।

এক মাথা ঢেউখেলা চুল, ভারী মিষ্টি মুখটা। গায়ের রঙ তো মেমসাহেবদের মতোই, যেহেতু জন্মের পর থেকেই ওদেশে কাটিয়ে এসেছে এতটা দিন। ভারী হাসিখুশি আর লক্ষী মেয়ে। কোনো একটা কঠিন বাংলা শব্দের মানে জানতে না পারলেই ছুটে আসতো আমার কাছে...

হাঁপাতে হাঁপাতে বলত, এই যে সুমন! (আমার ডাকনাম সুমন)

আমি হাতের সামনের বইটা সরিয়ে দিয়ে ঝট করে উঠে বসতাম বিছানা থেকে। বলতাম, কী হল?

এই শব্দটার মানে কী?

ওর একটা হাত আমার কাঁধে। সরু ফর্সা আঙ্গুল থেকে অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। ওর নিঃশ্বাসের বাতাস লাগছে আমার কানে।

কোন শব্দটা?

ওর হাতে একটা বই ধরা। একটা শব্দের নিচে পেন্সিলের দাগ। বাংলাটা মোটামুটি পারতাম, আর ওর মতো বিদেশ ফেরতা মেয়ের কাছে কেরদানি ফলাতেই পারি।

শব্দের অর্থ বলে দিতাম। আমার পাণ্ডিত্য দেখে ওর চোখ গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। লাফ দিয়ে বলত, দারুণ! আমি আম্মুকে বলে এসেছি, সুমন ঠিকই পারবে!

বলেই খুশিতে একটা দৌড় দিতো তাদের বাসার দিকে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে, পায়ের নূপুরে ঝুম ঝুম শব্দ তুলে...

এরকম একটা মেয়েকে ভালো না বেসে কি পারা যায়?

এতদিন পরে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখিয়ে থাকতাম। স্বপ্ন স্বপ্ন লাগত পুরো সময়টা, যতক্ষণ থাকতাম ওর সঙ্গে। খুব ভালো একটা কাজ করে ফেললে যেমন স্নিগ্ধ একটা অনুভূতি সারাদিন ঘিরে রাখে মনকে, সেরকমই একটা অন্তহীন আনন্দের বাষ্প ঘিরে থাকতো চারপাশ।

জানি না, রোজালিনের মনে কি কোথাও কোনো সবুজ চারাগাছ বেড়ে উঠেছিলো? সেখানে কি নিজের অজান্তেই প্রতিদিন জল দিতো, প্রতিটি সবুজ পাতায় রোদ্দুরের ঝিকিমিকি দেখে মুগ্ধ হতো?

আমার সঙ্গে মিশতে তার যে ভালো লাগত সেটা জানি। দু' জন মিলেই গল্প করে কাটিয়েছি কতো সময়। ওর ছোট বোন দোলা হয়তো এসে পাশে বসেছে মাঝেমধ্যে, কিন্তু বাকিটা সময় তো শুধু আমি আর রোজালিন। ও কি আমায় ভালোবেসেছিলো?

জানি না। আর কোনোদিন জানাও হবে না।

হয়তো বেসেছিলো। নইলে চলে যাবার আগের দিন কেনো পুরো সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গেই সময় কাটিয়েছিলো সে? তার বাসা থেকে ডেকে গেছে বেশ কয়েকবার, আমার বাসা থেকেও কয়েকবার মায়ের ক্রুদ্ধ চোখের ইঙ্গিত এসেছে পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু রোজালিন আর আমার গল্প ফুরোচ্ছিলো না। যাবার আগে আমার হাত ধরে সে বলেছিলো, আবার নিশ্চয় দেখা হবে!

আমিও বলেছিলাম, নিশ্চয় হবে!

হায়! আমরা তখন জানতাম না, এই পৃথিবীতে মানুষ হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর সবচে সহজ ঘটনা।

সেরকমই রোজালিন হারিয়ে গেছে। রোজালিন এখন আছে শুধুই স্মৃতিতে। আমার অস্তিত্বও রোজালিনের কাছে শুধু স্মৃতিতেই, যদি সে আমায় মনে রেখে থাকে। কোথাও না কোথাও নিশ্চয় সে আছে, যেমনটা আমি আছি, কিন্তু আমার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না এই যা!

পাঠক হয়তো আমার এই প্রেমের সময়কালটা জানতে চাইবেন। সেসময় আমার বয়সটাও।

সেটা ছিলো ১৯৮১ সাল, আমার বয়স তখন সাত। রোজালিনের ছয়।

যারা ভাবেন, বালকরা প্রেম-ভালোবাসা বোঝে না, তারা ভুল জানেন। তারাও ভালোবাসে, প্রেমে পড়ে, কষ্ট পায়। মনে রাখে, ভুলে যায় না।

আমিও যেমন ভুলো যাইনি রোজালিনকে।

কেমন আছো তুমি, রোজালিন?

ব্লগনাম: মৃদুল আহমেদ
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: ahmed.mridul@gmail.com

শেখ জলিল

প্রেমের ভরাডুবি

তখন আমার হৃদয় সাগরে উথাল-পাথাল প্রেমের জোয়ার বইছে। সবেমাত্র ফাইনাল শেষ করে ইন্টারনি ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে জয়েন করেছি। ছাত্রজীবনের বিশাল বাধা পরীক্ষার বৈতরণী নেই। ভারমুক্ত মনে নতুন উদ্যোমে কাজ করি। ডিউটি শেষে অফুরন্ত সময় পাই প্রেম নিয়ে ভাবনার। ওয়ার্ড, আউটডোর, ইমার্জেন্সি, কেন্টিন সবখানেই চোখ খোঁজে নতুন মুখ। হাস্যোচ্ছল ডানাকাটা পরীদের দেখলে চোখের পলক পড়ে না। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী, রোগীদের এটেনডেন্ট সবার মাঝেই তন্নতন্ন করে খুঁজি সেই মুখ।

এমন ভাবনার একদিনে হঠাৎ করেই চম্পার সাথে দেখা হলো আউটডোরে। ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম ওর মুখের দিকে। ও-ও আড়চোখে দেখছিলো আমাকে। সাহস করে কাছে গিয়ে বললাম - আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

অবাক বিস্ময়ে ও বলল- আপনাকে তো কোথাও দেখিনি।

আমি জোর দিয়ে বললাম- অবশ্যই কোথাও দেখা হয়েছে। আপনার বাড়ি কি ময়মনসিংহ শহরেই?

ও বলল - হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো মনে পড়ছে না।

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম - আপনার বাসা কি আনন্দমোহন কলেজের আশেপাশে?

আবারও বিস্ময়ভরা চোখে ও বলল - হ্যাঁ, কোথাও দেখা হয়েছে?

আমি বললাম - দেখা হয়েছে আনন্দমোহন কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। আপনি সেদিন কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশের "আট বছর আগের একদিন" কবিতাটি।

ওর চোখমুখ আনন্দে ভরে উঠছে। বুঝলাম ঢিল ঠিক জায়গায় পড়েছে। তারপর কিছু কথাবার্তা শেষে বাসার ঠিকানা ও ফোন নম্বর চেয়ে নিলাম।

আমি কবিতা লিখি। চম্পা ভালো আবৃত্তি করে। এ যেনো সোনায় সোহাগা। আমি এবং চম্পা ময়মনসিংহ শহরের সাহেব পার্ক, ব্রহ্মপুত্র নদের ধার, কৃষি ভার্সিটি চষে বেড়াই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে একযোগে অংশ নেই, উপভোগ করি। ভালোলাগা অনুভূতিগুলো শেয়ার করি। দু' জনের ভালোলাগা এক সময় ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়। মাঝে মাঝে আমার ব্যাচেলর বাসায় দু' জন মিলে ঘর কোণে নির্জনতার স্বাদ নেই। সকাল থেকে দুপুর কিংবা বিকেল রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মানে আমরা প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেলাম অল্প কিছুদিনের মধ্যেই।

ওয়ার্ড কিংবা কেবিন সবখানেই ইন্টারনি ডাক্তারদের ডাক পড়ে বেশি। রোগীদের প্রাত্যহিক চেকআপ, ড্রেসিং, স্যালাইন কিংবা বেড দেয়ার তদারকি তরুণ ডাক্তারদেরই করতে হয়। মর্নিং, ইভেনিং, নাইট পালা করে ডিউটি করতে হয় তাদের। এত পরিশ্রমের পরও ইন্টারনি ডাক্তারদের চোখেমুখে হাসি লেগেই থাকে। কারণ সবেমাত্র ডাক্তার হবার পর ফ্রেশ মানসিকতা ও হাসপাতাল জুড়ে ডানাকাটা পরীদের মুখশ্রী দর্শন। পরিচিত বন্ধুবান্ধব বা নিকট আত্মীয়স্বজনের রোগী এলে সেবার হৃদয়টা যেনো আরো খুলে যায়। সাথে হাস্যোচ্ছল তরুণী এটেনডেন্ট থাকলে তো খুশিতে সবাই আটখানা। ঘুরেফিরে বারবার রোগী দেখতে চলে যায় সেই কেবিন বা ওয়ার্ডে।

এমন একদিনে হাসপাতালে রোগী হয়ে এলো বেলী। মেডিক্যাল হাসপাতালের টেলিফোন অপারেটর সামছু ভাইয়ের গ্রাম থেকে এসেছে ও। আমার ভার পড়লো বেলীর অপারেশনের সময় ওটিতে প্রফেসরের সাথে এসিস্ট করার। মাঝে মাঝে ঢাকায় টেলিফোন করার সুবাদে সামছু ভাইয়ের সাথে আমার দারুণ খাতির। সামছু ভাই আগেভাগেই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন বেলীর মায়ের সাথে। তাঁকে খালাম্মা ডাকতে ডাকতে বেলীদের একেবারে কাছের মানুষ হয়ে গেলাম। অবস্থা এমনই যে খালাম্মা আমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। কলেজ পড়ুয়া দারুণ লাস্যময়ী তরুণী ছিলো বেলী। আমিও মজে গেলাম তাঁর রূপরসে। পোস্ট অপারেটিভে বেলীর বেডের পাশে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে তাকে পানি খাওয়াই, মুখ মুছে দেই। আর অপলক চোখে চেয়ে দেখি বেলীর সুন্দর মুখখানা। ভাবি, কখন আমার হবে বেলী!

একদিন সময় এলো সেই শুভক্ষণের। বেলীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হলো। কথা হলো বেলীরা আমার বাসায় বেড়াতে যাবে। আমার ব্যাচেলর ছোট্ট বাসা সুন্দর করে সাজালাম। সাধ্যমত ওদের আপ্যায়ন করলাম। বেলীর মা মানে আমার প্রাণের খালাম্মা ওদের গ্রামের বাড়ি আজমতপুরে বেড়াতে যাওয়ার কথা বললো। আজমতপুর ময়মনসিংহ শহরতলীর ছোট্ট একটি গ্রাম। সেখান থেকেই বেলী মুমিনুন্নেসা সরকারি কলেজে পড়তে আসে। এই সূত্রে বেলীর দেখা পাওয়ার একটা সুযোগ হয়ে গেলো। ততোদিনে তোড়েজোরে শুরু হয়ে গেলো আমার নতুন প্রেমের কাহিনী।

এদিকে মাঝে মাঝে চম্পাকেও মনে পড়ে। আমি সংস্কৃতিমনা কবি মানুষ। বাংলায় অনার্স পাস করা চম্পার চাহিদা আমার মনের কোঠরে। চম্পার আবৃত্তি ছিলো যেনো আমার আত্মার খাদ্য। ও কিছুদিন ঢাকায় বোনের বাড়ি বেড়াতে যাবার সুবাদে বেলীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিলো। অনেকদিন চম্পার সাথে আমার দেখা নেই। একদিন বুদ্ধি করে তাই কবির ভাষায় ছন্দ মিলিয়ে ওর কাছে একটি চিঠি লিখলাম। চিঠির ভাষা ছিলো এরকম:

যখন ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে খরা
আমার প্রেমের নদী ছিলো ভরা
বালুচরে ছিলাম আমরা দু' জন
দু' টি ফুলের একটি তোড়া
ব্রহ্মপুত্রের বুকে এখন অথই পানি
পাল্টে গেছে জীবন কাহিনী

..এইসব কথার। বেলীও তখন গ্রামের বাড়িতে। ওর কথাও ভীষণ মনে পড়ছে। কী মনে করে যেনো একই চিঠি শুধু নাম, সম্বোধন বদল করে পাঠিয়ে দিলাম বেলীর কাছেও।

সপ্তাহখানেক পর হাসপাতালে মর্নিং ডিউটি শেষে ফিরে দেখি বেলী আমার বাসায়। এক আশ্চর্য অনুভূতির জোয়ার বয়ে গেলো মনের কোণে। আমার চোখমুখ আনন্দে ভরে উঠলো। ওকে সাথে নিয়ে মজা করে দুপুরের খাবার খেলাম। বাসায় বদ্ধ রুমে দু' জনে মেতে উঠলাম গল্পে। বেলীর কিশোরী মুখ দেখছিলাম আর ডুবে যাচ্ছিলাম নতুন প্রেম ভাবনায়। বেলীকে কী করে যে পাই, কীভাবে যে তার হাতটা ধরি! এমন সময় হঠাৎ দরজায় টোকা। আমি কান খাড়া করলাম। দরজায় আঘাত বাড়তে লাগলো। নিরুপায় হয়ে দরজা খুলে দেখি চম্পা আমার সামনে খাড়া। চিঠি পেয়েই বোধ হয় ছুটে এসেছে আমাকে দেখার জন্য। কিন্তু ওর চোখমুখে তখন জ্বলছে আগুন। বাসায় বদ্ধ রুমে এভাবে একটি মেয়ের সাথে দেখে কোন্ প্রেমিকার না মনে আগুন জ্বলে! ওর অগ্নিমূর্তির সামনে কোনো যুক্তিই কাজে দিলো না আমার।

অনেক কথাই বলছিলো চম্পা। হাতের চিঠি দেখিয়ে বলছিলো- এই তোমার ভালোবাসার নমুনা, দু' টি ফুলের একটি তোড়া? এদিকে বেলীর চোখমুখেও তখন অবাক বিস্ময়। কারণ আমি কখনো চম্পার কথা বলিনি ওকে। ও-ও আমাকে দেখছে অপরাধীর চোখে। চম্পার কথার ঝড়ের মাঝে একটি কথাও বলেনি সে। শুধু রাগ অভিমানে আমাকে দেখছিলো আর শুনছিলো আমি কী বলি। তবে কোনো দোহাই, কথার মারপ্যাঁচে সেদিন ঠেকাতে পারিনি চম্পা-বেলীকে। আমাকে একা বাসায় রেখে দু' জনই সেদিন চলে যায় একসাথে।

এর বেশ কিছুদিন পরের কথা। বেলী কিংবা চম্পা কেউই আর আসেনি বাসায় অথবা হাসপাতালে। একদিন ডাকপিয়নের হাতে একটি চিঠি এলো আমার ঠিকানায়। খামের মাঝে আমাকে লেখা একটি কথাও ছিলো না সেই চিঠিতে। তবে বেলী ও চম্পাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম কাব্য করে তার দু' টো কপিই ছিলো সেই খামে। একসাথে সুন্দর করে ভাঁজ করা। সেই থেকে চম্পা ও বেলীর সাথে হয়েছিলো আমার চির বিচ্ছেদ, প্রেমের ভরাডুবি।

ব্লগনাম: শেখ জলিল
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: sheikhjalil@hotmail.com

অছ্যুৎ বলাই

বিয়ের গল্প

১

মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক করার স্বভাব আমার নেই। কিন্তু ঢাকা থেকে খুলনার এই মোটামুটি দূরপাল্লার বাসে পাশের সিটের সহযাত্রিনীটি যদি ক্যাটরিনা কাইফের মতো ধারালো সুন্দরী হয়, তাহলে তার দিকে আগ্রহ প্রকাশ না করা তাকে অপমান করারই শামিল। সে অবশ্য ক্যাটরিনার মতো অত ধবধবে ফর্সা নয়, তার ওপরে চোখে চিকনফ্রেমের চশমা। চশমা পরা মেয়ে অনেকে পছন্দ করে না, মাস্টারনী মাস্টারনী ভাবে। আমার সেই সমস্যা নেই। চশমা পরা মেয়েরা আমার কাছে অনেকটা কচ্ছপের মত। উপরে শক্ত খোলস, ভিতরে টলটলা মাংস। চশমাপরা অধিকাংশ মেয়েই মনের দিক থেকে ভালো হয়।

তিন বছর পরে দেশে এসেছি। বিয়ে করতে হবে। বাবা-মা' কে আগেই বলে রেখেছি। আশেপাশের আত্মীয়-স্বজনকেও বলে রাখা হয়েছে। অনেকেই মেয়ে দেখেছে। তবে ফাইনাল হবে আমার মতামতের ওপর ভিত্তি

করে। দেশে হঠাৎ গিয়ে মেয়ে দেখে বিয়ে করা অনেক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আশেপাশের ফ্রেন্ড বা বড়ো ভাইদের কেউই এক চান্সে কাজটা করতে পারে নাই। না পারার অনেক কারণ থাকতে পারে। কারো কারো চেহারা পছন্দ হয় না। ইউরোপের সাদা মাইয়াদেরকে দেখতে দেখতে চোখের বারোটা বেজে গেছে। আমার নিজেরও এই সমস্যা আছে। প্রথম যখন বিদেশে আসি, চারিদিকের ধবধবে ফর্সা মেয়েদেরকে দেখে কেবলই সুরাইয়ার কথা মনে পড়ে। সুরাইয়া স্কুলে ক্লাসমেট ছিলো। স্কিনের বিরাট অংশ জুড়ে শ্রীলংকার ম্যাপের ডিজাইনে অতি ফর্সা দাগ। এইটা নাকি কুষ্ঠ রোগ। দেখতে বিচ্ছিরি লাগে। ইউরোপের ধবলা মেয়েদের দেখেও কাছাকাছি অনুভূতি হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই সয়ে যায়। চোখে এবং মনে। এই ধবল মেয়েগুলোকে দেখেই তখন মনে হয় এক একটা আস্ত চলমান কবিতা। সমস্যা হলো, সমস্যার এখানেই শেষ নয়, শুরু। এই চোখে সয়ে যাওয়া ধবল মেয়েদের কল্যাণে হঠাৎ গিয়ে দেশের মেয়েদেরকে মনে হয় রোগা এবং কালো। নাক-চোখ-মুখ অতো টানা টানা নয়, শ্যামলা মেয়ের লাবণ্যে অভিযোজিত হওয়ার আগেভাগেই ছুটির সময় শেষ হয়ে যায়। খালি হাতে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলয়ন করতে করতে বাংলাদেশ ক্রিকেট টীমের মতো "অনেককিছু শিখলাম, সামনের বছর দেখে নেবো" ভাবতে ভাবতে ঘরের ছেলে বিদেশে চলে আসতে হয়।

সামনের বছরে অবশ্য অনেকেই দেখে নেয়, তবে সেটা নিশ্চিতভাবেই ইনিশিয়াল রিকোয়ারমেন্টে অনেক ছাড়টাড় দিয়ে। মেয়ে তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হলেও চলে, একটু মোটা হলেও কোনো ব্যাপার না, মেয়ের বাপ প্রথম দশজন ব্যাবসায়ীর একজন হতেই হবে, এরকম ধনুকভাঙ্গা পণ থেকেও বেরিয়ে আসতে হয়।

এদিক দিয়ে আমি অবশ্য খাপছাড়া তলোয়ারের মতো বেপরোয়া। দরকার হলে পায়ে চাকা লাগায়া ঘুরবো, ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে গিয়া চোখে পড়া সুন্দরী মেয়েদেরকে নিজেই প্রস্তাব দিয়া রাজি করাতে হলেও বিয়ে করেই ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে খালি হাতে ফিরলে হাতের ওপর চাপ কমে না; বরং বাড়ে। এমনিতেই বাংলা ব্লগিং আসার পরে হাতের ওপর প্রেসার দ্বিগুণ হয়েছে। সুতরাং পাশের সিটের ক্যাটরিনা কাইফের সাথে আলাপ জমাতে বেশি সময় নেই না। তার নাম অবশ্য ক্যাটরিনা নয়, লীনা। বেশ মিশুকই মনে হলো। তবে প্রফেশনের কথা শুনে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলাম। ডাক্তার মাইয়া আমার পছন্দ না। তার ওপর সে ইন্টার্নী করে। কিছুদিন পরেই পুরোদমে প্র্যাকটিস শুরু করবে। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে আমার লিস্ট থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বাদ। নিজে এমনিতেই উড়নচন্ডী মানুষ, এরপরে পাশে থেকে একজন সারাক্ষণ ক্যারিয়ার নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করবে, এই করো, সেই করো উপদেশ ঝাড়বে, সেই জীবনের চাইতে তিব্বতে সন্ন্যাস নেয়া অনেক ভালো।

চুপসে যাওয়া ভাবটা সহজেই কাটিয়ে উঠি। এ কথা, সে কথা বলি। অলস জীবনের একটা বিশাল অংশ জুড়ে পরীক্ষার পড়া বাদ দিয়ে শুধু এপার ওপারের লেখকদের লেখা বই পড়ে কাটিয়েছি। শীর্ষেন্দু আমার প্রিয় লেখক। তার ও। বন্ধুত্ব জমে ওঠে। রুশ সাহিত্যের সে বিরাট ভক্ত। আমি অবশ্য বেশকিছু অনুবাদ পড়েছি। গোর্কিকে আমার তেমন ভালো লাগে না। কষ্টের চিত্র থেকে আমি পালাতে চাই। তার অবশ্য সে সমস্যা নেই। সে গোর্কিরও ভক্ত। টলস্তয়ের প্রাথমিক বিশৃঙ্খল জীবনকেই আমার কাছে প্রকৃত জীবন মনে হয়, জীবনে বিশৃঙ্খলাই যদি না থাকে, তবে আর থাকলোটা কি? লীনা অবশ্য আমার তুলনায় অনেক ধীর-স্থির, উড়নচন্ডীপনা তার ভালো লাগে না। এটা হতেই হবে যে! বলেছি না, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেনো পাত্রী হিসেবে আমার অপছন্দ!

বাস ফেরিতে ওঠে। দুজনেই নামি, ফেরির ডেকে উঠে দেখতে থাকি শীতের শুকিয়ে যাওয়া এক সময়ের প্রমত্তা পদ্মাকে। তার যৌবন সেই কবে শুকিয়ে গেছে। চানাচুর-ঝালমুড়িওয়ালার কাছ থেকে ঝালমুড়ি কিনি। দু' জনের জন্যই। ছোট ছোট পালতোলা নৌকা এখনো অবশিষ্ট আছে। নদীতে হাওয়া বয়। শীতের দুপুরে ঝকমকা রোদ্দুরে এই বাতাসটা আমার অসাধারণ লাগে। মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত দুঃখকষ্টকে এক মুহূর্তে ভুলিয়ে দিতে এ হাওয়ার জুড়ি নেই। কবিতা না লিখলেও নিজের ভেতর থেকে কবি বের হয়ে আসে। আমি সম্মোহিত হয়ে যাই। লীনার চোখে চোখ রাখি। ঘোরলাগা চোখ। তবে ঘোর কাটিয়ে উঠি সহজেই। সে যে ডাক্তার!

কথায় কথায় আমার এক ক্লোজফ্রেন্ডের সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব দেই। ফ্রেন্ডের ডাক্তারে আপত্তি নেই; বরং উৎসাহই আছে। তার বাবার নাকি শখ, ছেলেকে ডাক্তার বানাতে পারলেন না, এখন ছেলের বউ ডাক্তার চাই। লীনা আমাকে এক কথায় নাকচ করে দিলো। সে ডাক্তার ছেলে ছাড়া বিয়ে করবেই না। যাক, সবারই কিছু ক্যালকুলেশন আছে। বেশি মাথা ঘামাই না। ফোন নাম্বার বিনিময় হয়। বাস খুলনায় এসে পৌঁছালে চলে যাই যে যার গন্তব্যে।

২

আমার খুলনায় আসার প্রধান কারণ লিপির সাথে দেখা করা। লিপিও বিয়ের সম্ভাব্য পাত্রীদের মধ্যে একজন। বায়োটেকনোলজির ছাত্রী। রোকেয়া হলে (ঢাকার না, খুলনার) থাকে। তার সাথে দেখা করে কিছুটা হতাশ হই। মেয়েটা ভালো। অত্যন্ত মিশুক, তেমন জড়তা নেই, মনেই হয় না যে আমার সাথে তার এইমাত্র পরিচয় হলো। কিন্তু তার চেহারা আমার পছন্দ হয় না। তেমন আকর্ষণ বোধ করি না। "চেহারা কিছু না", "কালা মাইয়া গলার মালা" বলে অনেকেই ইতংবিতং যতো ফতোয়াই দিক না কেনো, আমার কাছে চেহারার গুরুত্ব অনেক। পাশ থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে হেঁটে গেলে তারপরে বউয়ের দিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়াদের দলে আমি থাকতে চাই না। ঘন্টা খানেকের আলাপ শেষে লিপি ধীর পায়ে হলের দিকে যেতে থাকে, আমার স্মৃতি থেকেও অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে গত একটি ঘন্টা। পরদিনই ঢাকায় ফিরে আসি।

অপর্ণার সাথে বিয়ের সম্বন্ধটা আসে এক দূরসম্পর্কের মামার মাধ্যমে। অপর্ণার মামা আবার আমার সেই মামার ব্যবসায়ীক বন্ধু। সে চারুকলায় পড়ে। খুবই স্মার্ট এবং সাবলীল সুন্দর। মাঝারি মানের একটি চেহারাকেও কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তা সে ভালোমতোই জানে। ওদের ফ্যামিলিটাও দুর্দান্ত রকমের কালচারড। দুইদিন দেখা করেছি। অনেক কথাই বলেছি। মনে হচ্ছে, আগানো যায়। এর মধ্যে একদিন দেখি প্রফেসরের ইমেইল। আসলে অন্য আরেকটি ইমেইল তিনি ফরোয়ার্ড করেছেন। মকবুল হোসেন নামে একজন তাকে ইমেইল করে জানতে চেয়েছে আমি আসলেই তার আন্ডারে পিএইচডি করি কিনা। প্রফেসর ব্যাপারটার শানে নুযূল ধরতে না পেরে আমাকেই ফরোয়ার্ড করেছেন, কী জবাব দিবেন তা জানতে চেয়ে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অপর্ণার সাথে সম্বন্ধটা আর আগানো হয় না, আমি একটু ঘাড়তেড়া মানুষ আর জনাব মকবুল হোসেন অপর্ণার মামা।

এর মধ্যে এক খালার বিয়ের দাওয়াতে যাই। আমি তখন মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে কুত্তাপাগোল অবস্থা। এক মেয়ের চেহারা পছন্দ হয়, খোঁজ নিয়ে জানা যায় মাত্র কলেজে পড়ে। নিজে যে কবে আইবুড়ো হয়ে গিয়েছি আর এরকম সুন্দরী মেয়েগুলো নিয়ে চিন্তা করার অধিকার হারিয়েছি, তা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা হালকা চিনচিনে ব্যথা হয়। আরেকটা মেয়ের সাথে আলাপ হয়। ইউনিভার্সিটিতেই পড়ে; কিন্তু নোয়াখালি অরিজিন। একবার পাবনায় গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে। আমার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা শুনে তারা দেখি কেমন ডরায়, নোয়াখালি-ফেনী সম্বন্ধে এরকম একটা ডর আমারও আছে। তার ওপরে মেয়ে পড়ে সেকেন্ড ইয়ারে। কথা বলতে বলতে বের করি, পড়াশোনা শেষ করার আগে সে কোথাও মুভ করতে রাজি নয়। তাকে বিয়ে করে আরো বছর তিনেক যদি আমাকে ব্যাচেলর জীবনযাপন করতে হয়, তাইলে আর বিয়ে করার দরকার কী?

ছুটির দিনগুলো হু হু করে চলে যেতে থাকে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে হতাশা। মিশন ব্যর্থ হওয়ার মুখে। এর মধ্যে আরেকটা মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, বিবিএ। অরিজিন আমাদের এলাকারই। মেয়ে পর্দা করে, ফ্যামিলিও ধার্মিক। খুবই ভালো কথা। মেয়ের বাবা ওকালতি করেন। সেটাও ফাইন। পুলিশের মেয়ে নিয়ে আমার ফ্যামিলিতে একটু রেস্ট্রিকশন আছে, তবে উকিলে সমস্যা নেই। হুমায়রার সাথে দেখা হয় ফ্যামিলিগত অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমেই। কথা বেশি হয় না। তবে কৌশলে তার ফোন নম্বর নিয়ে নেই। দুইদিন পরে আবার বাইরে মিট করি তার সাথে। পর্দা করলেও সে অনেক আধুনিক। তার কথায় চমৎকৃত হই। ভালো লাগে, অনেক ভালো। এর মধ্যে অবশ্য জার্মানি থেকে এক ফ্রেন্ডের ফোন পাই। আমার গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা, স্বভাব চরিত্র কেমন ইত্যকার সার্টিফিকেটের জন্য আমার ওই ফ্রেন্ডের সাথেই যোগাযোগ

করেছে হুমায়রার ফ্যামিলি থেকে। একটু বিরক্ত হই। আমার যদি গার্লফ্রেন্ডই থাকে, তাইলে এই বয়সে কেনো বিয়ের মতো একটা ঝামেলায় জড়াবো? তবে অপর্ণা কেসের মতো এটায় আর মেজাজ তেমন খারাপ হয় না। তাদের দিকেও যুক্তি আছে, বিশেষ করে প্রবাসে থাকা ছেলের ক্ষেত্রে এদিকটায় একটু সাবধান হলেই আর অপি করিম-আশীর কেস হয় না।

হুমায়রার সাথে কথাবার্তা এগোতে থাকে। ছুটির আর বেশি বাকি না থাকলেও মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত মিশনে সাকসেসফুলই হতে যাচ্ছি। নিজের কাছে অনেক ফুরফুরে লাগে। অনেক রাত পর্যন্ত মোবাইলে কথা চলে হুমায়রার সাথে। অনেক আধুনিক সে। চাপাচাপির পরে জানায়, এমনকি এক বাংলাব্লগেও নাকি তার একটা অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেখানে সে নিয়মিত লেখে।

কথায় আছে, মানুষ একটা কিছু চায় আর আল্লায় সেই চাওয়াটার পোন মেরে দেন। তবে এন্ড রেজাল্টে আবার আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। আমার এক দাদা আছেন, মাস্টার দাদা ডাকি। উনি প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড। এখানে সম্বন্ধের কথা শুনে খুশি হওয়ার পরিবর্তে দেখি চিন্তিত হয়ে পড়েন। হুমায়রার দাদা নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের একালায় শান্তিকমিটির মাথা ছিলেন! আমার খারাপ লাগে খুব, বুকটা ভেঙ্গে যেতে চায়, তবু হুমায়রার সাথে সম্পর্ক কাট করে ফেলি। এরকম একটা ফ্যামিলির সাথে সম্পর্ক করার কোনো মানে হয় না। ছুটি শেষ হয়ে যায়। আর দশটা বড় ভাইয়ের মতোই আমিও খালিহাতে ফিরে আসি। কিছু অভিজ্ঞতাই সাথে থেকে যায়। অভিজ্ঞতার দাম অনেক হলেও সেই অভিজ্ঞতা ধুয়ে পানি খেয়ে আমার এখন কোন উপকারে আসবে, ভেবে ঠিক যুইত করতে পারি না।

৩

পাত্রী খোঁজার চক্কর আর এর সাথে দেখা, ওর সাথে কথা বলতে বলতে দেশে থাকতে লীনার সাথে তেমন যোগাযোগ হয় নি। মাঝে একদিন ফোন করেছিলাম আর চলে আসার আগে একবার ফোন করে বলে এসেছি, চলে যাচ্ছি। সে যথারীতি স্বাভাবিকভাবেই শুভকামনা জানিয়েছে, তবে একবারো বাড়তি খাঁজুরে আলাপে উৎসাহ দেখায় নাই।

দেশ ছেড়ে আসার পরে অবশ্য সময় অনেক শান্ত। রুটিনমাফিক জীবন। প্রতিদিন রাত দশটায় অফিস থেকে ফিরে পিজা গরম করে খেয়ে রাতটা কাটিয়ে আবার সকালে অফিস - এই রুটিনের মাঝেও অনেক সময়ই একটা শূন্যতা এসে ভর করে। অনেক ছোট ছোট মান-অভিমান, কনফ্লিক্ট ত্যাগ করে মানুষ কেমন যেনো উদার হয়ে যায়। তখন অতীতের কিছু সুন্দর স্মৃতি এসে তাকে অধিকার করে ফেলতে চায়। সে স্মৃতির টান অনেক। হয়তো এরকম কোনো টান থেকেই দেশ থেকে ফিরে আসার মাস খানেক পরে লীনাকে ফোন করি। তার রিঅ্যাকশন যা ভেবেছিলাম, তার ঠিক উলটা। "কেমন আছো, ভালো আছি, রাখি, বাই" না বলে সে উচ্ছ্বাসের সাথেই জানায় আমার ফোন পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছে।

আলাপে আলাপে জানায়, আমার ফ্রেন্ডের বিয়ের প্রস্তাবে রুক্ষভাবে না বলায় সে দুঃখিত। আসলে তার একজনের সাথে সম্পর্ক আছে। ক্লাসমেট। আর ডাক্তারদের জন্য ডাক্তার ম্যাচিংই বোধহয় বেস্ট। আমি এরকম কিছু সন্দেহ করেছিলাম। তাদেরকে গুডলাক জানাই। কিছু মনে করি নাই বলি। তারপর এ কথা, সে কথা। তবে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা আর হয় নাই। সে ও তোলে না, আমাকেও পাগোলে কামড়ায় নাই যে, অন্যের বাগদত্তার সাথে শীর্ষেন্দু-হুমায়ূন নিয়ে আলাপ করে টেলিফোন বিল গচ্চা দিবো।

তবে লীনাকে ফ্রেন্ড হিসেবে অনেক ভালো মনে হয়। প্রায় প্রত্যেক উইকএন্ডেই তার সাথে কথা হতে থাকে। রাতের ঘুম কামাই দিয়ে সেও আমার সাথে কথা বলে। সেই প্রবাসী শূন্যতাটা আর তেমন বোধ করি না এখন। তার বয়ফ্রেন্ড সম্বন্ধে কথা হয় খুবই কম। পারসোনাল ব্যাপারে বামহাত ঢুকানোর মতো বন্ধুত্ব তার সাথে এখনো হয়নি বলেই মনে হয়। তবে মাসদুয়েক পরে সে নিজে থেকেই বলে, শিশিরের সাথে তার

সম্পর্কটা টিকছে না আর। তেমন কোনো ভিজিবল সমস্যা নেই, তবে সে কেনো যেনো আর শিশিরের প্রতি তেমন টান অনুভব করে না।

লীনা ডাক্তার। তবে ডাক্তারেরও বন্ধু প্রয়োজন হয়। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি, এ অবস্থাটা সাময়িক। দু' জন মানুষ একসাথে অনেকদিন থাকলে এরকমটা হতেই পারে। কিন্তু আবার একসময় ঠিক হয়ে যায়, টানটা ঠিকই অক্ষুণ্ন থাকে। আমার কথায় সে খুব একটা প্রভাবিত হয় বলে মনে হয় না। আমিও প্রসঙ্গান্তরে চলে যাই। সে ভালো কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতা নাকি লেখেও। অনেক চাপাচাপির পর তার লেখা কবিতা আমাকে শোনাতে বাধ্য হয়। অবশ্য একসময়ে তাকে আর চাপচাপি করতে হয় না। নতুন কী লিখেছে, নিজে থেকেই আমাকে শোনায়। আমার প্রশংসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। আমি ব্যাপারটা উপভোগ করি। সাথে তাকে খোঁচানোর চান্স নিতেও ছাড়ি না। কোনো কবিতা "জঘন্য হয়েছে" বললেই সে শিশুর মতো অভিমান শুরু করে দেয়। এই চশমা পরা কচ্ছপ মেয়েটিকে আমার ভালো লাগে, অনেক ভালো।

তার চাপাচাপিতে আমিও অনেকটা যেনো শৈশবে ফিরে যাই। সবকিছুই কেমন যেনো স্বাভাবিক মনে হয়। আল্লাহ আমাকে অনেক গুণ দিয়েছেন। ক্রিকেটটা ভালো খেলি, নিশ্চিত হারের পক্ষ নিয়েও কুটবিতর্কে জিতে যাই, ভালোমানুষ ননীর পুতুলদেরই নয়, অনেক শক্তপোক্ত পোঁড় খাওয়া মানুষকেও পঁচিয়ে কাঁদিয়ে দিতে পারি; কিন্তু যে কাজটায় আমার প্রতিভা মোটেই খোলে না, তা হলো গান গাওয়া। ছোটবেলা একবার বিয়ে বাড়িতে গান গাওয়া শুরু করেছিলাম। "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়", সেই টান দিতে গিয়া দম বন্ধ হওয়ার যোগাড়, আশেপাশে যারা ছিলো তারাও অপমান করার সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারায় নাই। আমিও আর মনের ভুলেও গান দূরে থাক, গুনগুনেরও চেষ্টা করি নাই। কিন্তু এই কচ্ছপ স্বভাবের মাইয়া ভিতরে ভিতরে এত পোংটা কে জানতো। আমার ভিতরে যে আসলে একটা লুকানো সঙ্গীতপ্রতিভা আছে, এইটা সে নিশ্চিত। আমি বুঝি, এইটা আমাকে পঁচিয়ে মজা লোটা, তবুও তাকে গেয়ে শোনাই:

ফুলের কানে ভ্রমর এসে চুপি চুপি বলে যায়,

তোমায় আমার সারাটি হৃদয় নীরবে জড়াতে চায়।

সময় হু-হু করে কেটে যায়, চোখের পলকে পার হয়ে যায় প্রতিটা সপ্তাহ। মাসগুলো কাবার হয়ে যায়। অবশ্য মাস কাবার হয়ে যাওয়ায় তেমন খারাপ লাগে না। মাসের শেষে বেতন পাওয়া যায় যে! তবে পড়ে থাকা কাজের পিছনে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে উঠি। সেই হাঁপিয়ে ওঠা জীবনে এক টুকরো অবসরের মতো সবসময়ই জড়িয়ে থাকে সে। একদিন আচমকা ভাবলেশহীনভাবে বলে, শিশিরের সাথে সম্পর্কটা সে পুরোপুরি শেষ করে ফেলেছে। শিশিরের জন্য তার কষ্ট হয়; কিন্তু আকর্ষণহীন ভালোবাসার অভিনয়টাও সে করতে পারবে না। অতএব, ব্যাপারটা সুমধুর না হলেও বাস্তবতাকে মেনে নেয়াই তার মতে সবচেয়ে ভালো সমাধান। আমি এই নিয়ে বেশি কথা বলি না। যার ভাবনা, সে-ই ভাবুক।

৪

এর মধ্যেই প্রায় বছর কেটে গেছে। ডিসেম্বরে আবার দেশে যাই। ইতিমধ্যে লীনার ফ্যামিলির কাছেও আমি পরিচিত, আমার ফ্যামিলির কাছেও সে। কিন্তু এই পরিচয় শুধুই বন্ধুত্বের, তার বিয়ের জন্যও ছেলে খোঁজা হচ্ছে, আমার জন্যও পাত্রী লিস্টে এবারো বেশকিছু নাম জমা হয়েছে।

দেশে গিয়ে তার সাথে ফোনে কথা হয়। কিন্তু দেখা করার কথা বলি না। কৌশলে তার পরবর্তী কয়েকদিনের রুটিন জেনে নেই। আগামী পরশু সে বাসায়ই থাকবে। তার বাসায় গিয়ে হাজির হই। ক্যাটরিনার চোখে এবার আর চশমা নেই। কেমন অন্যরকম লাগে চেহারা। মানুষ সম্ভবত প্রিয় কারো চেহারা ঠিকমতো কল্পনা করতে পারে না; বরং কল্পনার চেহারাটা হয় শূন্য, না হয় অন্যরকম একটা কিছু থাকে। কল্পনার লীনার চেয়ে তাকে অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়। ক্যাটরিনার সাথে তুলনা করে এতদিন আমি অযথাই তার অপমান করেছি।

লীনার আম্মু বাসায় ছিলেন। জানাই, তার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই। তাকে নিজের সম্বন্ধে একদফা বয়ান দিয়ে বলি, এই ছেলেটিকে তার

মেয়ের জন্য তার পছন্দ কিনা। তার দিক থেকে আপত্তি নেই, তবে মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মেয়ের সাথে তিনি এরপর একান্তে কিছুক্ষণ কথা বলেন। আমি একা একা ড্রয়িং রুমে বসে চায়ে চুমুক দেই। কিছুক্ষণ পরে দু' জনেই আসেন। মেয়েরও আপত্তি নেই। তবে মেয়ের চোখে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি, সেই মুহূর্তে তিনি সাথে না থাকলে এই ছলাকলার জন্য মেয়ে আমাকে মেরেই বসতো!

লীনার বাবা ও অন্যান্য মুরুব্বিদের সাথে আলাপ করে বিয়ের দিন ধার্য হয় ৩ দিন পরেই, শুক্রবার। বিয়ে হয়ে যায়। হয়ে যায় মালাবদল। তার চোখে আজ চশমা নেই। বিয়ের আসরে মেয়ের চোখে চশমা থাকে না। কচ্ছপের খোলসটাও কোথাও উধাও হয়ে গেছে, তার টলটলে মনটা আমার কাছে এখন পুরোই উন্মুক্ত।

ব্লগনাম: অছ্যুৎ বলাই
ইমেইল: chormia@googlemail.com

এস এম মাহবুব মুর্শেদ

লে ভয়াজ ডি দিনাজপুর

ঘটনাটার সময়কাল ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন হবে। সম্ভবত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি তখন। আমার ছোট ভাইও সম্ভবত মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। একসাথে তাই ছুটি কাটাতে গিয়েছি সেজ খালার বাসায় রংপুরে। সেজ খালার আমাদের সমবয়সী দু' টো ছেলে আছে। বড়টা করিম, আমার সমবয়সী। ছোটটা রহিম, আমার ছোটভাইয়ের সমবয়সী। বলাবাহুল্য আসল নাম বদলে রহিম আর করিম ব্যবহার করা হয়েছে এখানে।

অল্পবয়সী চার বান্দর এক সাথে হলে কী হয় বোঝেনই তো! রাত-দিন আড্ডা। ঘুর ঘুর এদিক থেকে ওদিকে। টাংকি মারার চেষ্টা। আমাদের সাথে আরো ছিলো রিপন আর আম্মান। এর মাঝে করিম একদিন আড্ডা মারতে মারতে দাবী করে বসলো এক সুন্দরী মেয়ে তার আবেদনে সাড়া দিয়েছিলো।

করিম এমনিতে একটু বোকাসোকা। তাই সমস্ত রকম পঁচানোর কর্মকান্ড আমরা তারউপর দিয়ে চালাতাম। মনে করেন, সবাই গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছি। বাইরে থেকে আমাদের কেউ একজন আসল, তো করিমের মাথায়ই চাঁটি মেরে বলতাম, "এই সাঁওতাল যা সরি বস।" করিমের মিশমিশে কালাহ্ গায়ের রং আর ভাঙ্গা চোয়ালের জন্য আমরা সাঁওতাল ডাকতাম। সরি, নো অফেন্স টু রিয়েল সাঁওতাল।

তো এই করিম নাকি প্রেম করে! করিমের দাবী শুনে আমরা হেসেই বাঁচিনা।

রিপন বলে, "সাঁওতাল নাকি পেরেম করিচ্ছে। হি হি হি..."

আমি বললাম, "যাহ শালা চাপা মারিস না! হা হা হা..."

রংপুর জেলা স্কুল মাঠে বসে ছিলাম আমরা। বাকিরা হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ল। করিম খুব আহত একটা চেহারা নিয়ে বসে থাকল। হাসতে হাসতে আমরা যখন একটু ধাতস্থ হলাম তখন করিম বলে, "বিশ্বাস করিস না? চল আমার সাথে, দেখা করাব।"

আমরা তখন একটু একটু নড়ে চড়ে বসলাম।

"দেখা করাবি মানে? থাকে কোথায়?"

"দিনাজপুর," করিম একটু ভাব মেরে বলে।

"দিনাজপুর?" আমরা এর ওর দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম।

করিম জানে সে দিনাজপুরের কথা বলায় কেউ তো আর যাচাই করতে যাচ্ছে না। সুতরাং সেইফলি চাপাটা মারা যাবে।

"তোর সাথে এখনও যোগাযোগ আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আছে মানে? সেদিনই তো কথা হল।" করিম বলে।

"হামরা গেলি চিনবু?" রিপন জিজ্ঞেস করে।

"না চিনার কি আছে?"

"তাহলে চল দেখা করে আসি", আমি প্রস্তাব করলাম। অনেকটা সত্যতা যাচাই, অনেকটা অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যে। করিমের কালো মুখটা যেনো আরো কালো হয়ে এলো।

তা দেখে আম্মান বলে ওঠে, "এরে মিত্যা বলিচ্ছু কেঠে রে?"

করিম ডেসপারেট হয়ে উঠে, "মিথ্যা? বললাম তো, যাবি তো চল!"

আমরা সিরিয়াসলি প্ল্যান করে ফেলি যে দিনাজপুর যাবো। যাবোই যখন একই সাথে কান্তজীর মন্দির আর দিনাজপুর রাজার বাড়ি দেখা হবে। আগে এসব দেখব, তারপর বিকেলে মেয়ের সাথে দেখা করে বাড়ি ফিরব।

পরদিন সকালে আমরা রওনা দেই। আমরা দুই ভাই, করিমরা দুই ভাই, রিপন আর আম্মান; মোট ছয়জন। রিপন জানালো বাসে করে মূল দিনাজপুর নামার আগের একটা স্টপেজে নামতে হবে। তারপর ভ্যানে করে মাইল দুয়েক গেলে একটা নদী পড়বে। সেই নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে মাইলখানেক হাঁটলে পরে কান্তজীর মন্দিরে পৌছে যাবো আমরা। নিজেদের গাড়ী না থাকলে নাকি এটাই বেস্ট রাস্তা।

আমরা টিকিট কেটে চটপট উঠে পড়লাম বাসে। বাস থেকে নেমে ভ্যানে করে নদী তীরে যখন পৌছলাম তখন পেটে চোঁ চোঁ খিদে। নদী পাড়েই ছোট হোটেল, পানের দোকান ইত্যাদি ছিলো। হোটেল থেকে শিঙ্গাড়া খেয়ে নিলাম আমরা। এর মাঝেই আমাদের হো হো হি হি চলছিলো। বিকেলে মেয়ের সাথে দেখা হলে কার কী প্রতিক্রিয়া হবে এইসব নিয়ে আলোচনা। আর বয়সটাই এমন যে কোনো বিষয় লাগে না, সবকিছুতেই হাসি আসে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা নদী তীরের দিকে যাচ্ছি। দেখি যে নদীর পাড়টা কেমন যেনো সন্দেহজনক। কাদা থাকতে পারে ভেবে আমরা এদিক ওদিক তাকিয়ে সংকীর্ণ একটা হাঁটা পথ দেখে সেদিকে রওনা দিলাম। আমরা পাঁচজন একই দিকে গিয়েছি দেখে করিমের কী যেনো মনে হল। সে স্মার্টলী কাদা আছে বলে আমরা যেখানটায় সন্দেহ করেছিলাম সেদিকে রওনা হল।

ব্যাস আর যায় কই! ঘ্যাঁচ করে হাটুঁ পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেলো করিম। তাই দেখে আমাদের হাসি আর দেখে কে? হা হা হা হা, হো হো হো হো, হি হি হি হি চলছেই... এরমাঝে একজন বলে, "ভাই জলদি টানি তোলেন, নায় তো আরো ডাবি যাবে।" আমরা হাসি চাপতে চাপতে গিয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে তুললাম ব্যাটাকে।

নদী তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি যে নদীটা ঠিক ওই জায়গাটাতেই বাঁক খেয়েছে। বাঁক খাবার কারনে নদীটা প্রচন্ড খরস্রোতা। জায়গায় জায়গায় দেখি জলঘুর্নি দিচ্ছে। উল্টো দিকে লক্ষ্য করলাম পারাপারের যে একমাত্র নৌকা সেটা ডুবে গেছে। খানিকটা উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। তবে ঐ পারের কাছে গিয়ে ডুবেছে বলে পটাপট মানুষগুলো পাড়ে উঠে পড়তে দেখলাম।

এইসব দেখে আমরা একটু ভয় পেয়ে নদীর পাড় থেকে খানিকটা দুরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আলাপ করছি। ভাবছি ফিরে যাবো কিনা। রিপন অভয় দিচ্ছে যে সে বেশ কয়েকবার এসেছিলো। কোনো সমস্যা হবে না।

এই সময়টায় করিম তার কালো প্যান্টে লেগে থাকা ধুসরে কাদা পরিষ্কার করছিলো। কোত্থেকে একটা কাঠি জোগাড় করেছে সেটা দিয়ে চেঁচে তুলে ফেলছিলো কাদাগুলো। নদী যে ভয়াবহ খরস্রোতা, ওপারে যে মানুষ ডুবে যাচ্ছিলো এতসব খেয়াল করেনি। হাজার হোক প্রেমিকার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে! হঠাৎ তার মনে হলো আরে সামনেই তো নদী। পানি দিয়ে একটু পরিষ্কার করলে মন্দ হয় না।

যেই ভাবা সেই কাজ। নদীর তীরে একটা ঝুলন্ত অংশ মতো ছিলো। সে সেখানটায় গিয়ে পা বাড়িয়ে ধরলো পানিতে। নদীর সেই ঝুলন্ত অংশটা ছিলো ভেতর থেকে খয়ে যাওয়া একটা বাড়তি পাটাতন। অর্থাৎ উপর থেকে শক্তপোক্ত প্ল্যাটফর্মের মতো মনে হলেও আসলে ফাঁপা ছিলো সেটা। করিম দাঁড়ানোর সাথে সাথে হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেলো পানিতে।

বুক পর্যন্ত পানিতে চলে যেতে যেতে করিম কোনো রকমে পাড়টা আঁকড়ে ধরল। পাড় ধরে ভয়াবহ আতঙ্কে, হতভম্ব হয়ে আমাদের দিকে

কান্তজীর মন্দির
© http://www.flickr.com/photos/rizwanoola/

তাকিয়ে আছে করিম। এই দৃশ্য দেখে আমাদের হাসি আর থামায় কে? হাসতে হাসতে আমাদের পেদে ফেলার দশা।

হাসতে হাসতেই আমরা গিয়ে করিমকে টেনে তুললাম পানি থেকে। আমাদের লাল্টু ব্রাদার কাদা মেখে, পানিতে ভিজে আজকে যাবে শ্বশুর বাড়ি! এই নিয়ে আরো কয়েক দফা হাসাহাসি চললো আমাদের।

দিনাজপুর রাজবাড়ি
© http://www.flickr.com/photos/tamal-imran/

শেষমেষ নৌকা এলে পরে ভয়ে ভয়ে উঠলাম আমরা। তবে খরস্রোতা হলেও এইবারে ঠিকঠাক মতো পার হলাম। তারপর মাইল খানেক হেঁটে পৌঁছলাম কান্তজীর মন্দিরে। মন্দিরটা সুন্দর। প্রচুর টেরাকোটা নিদর্শনে মোড়ানো দামী একটা ঐতিহ্য আমাদের। অথচ যত্নের অভাবে করুন দশা।

এরপর সেখান থেকে রিক্সায় করে রাজবাড়ি দর্শনে গেলাম। সেখানেও প্রাচীন নির্দশনগুলোর একই রকম হতদরিদ্র অবস্থা দেখতে পেলাম। ততক্ষণে দুপুর হয়ে গেছে। তাই দিনাজপুরের এক হোটেলে খেয়ে নিলাম আমরা চটপট। হোটেলের বাথরুমে একটু পরিষ্কার হবার চেষ্টা করলাম আমরা। চুলটা একটা পরিপাটি করে, কোমরে শার্টটা গুঁজে ভদ্রস্ত হবার চেষ্টা আরকি।

আমাদের ধারনা ছিলো করিম হয়তো শেষমেষ স্বীকার করবে যে মেয়েটির কথা ভুয়া। আমি আর আম্মান তাকে কয়েক বার বলেছি, "স্বীকার কর যে তোর কারো সাথে কিছু নাই, আমরা বাড়ি ফিরে আর কাউকে কিছু বলব না।" কিন্তু করিম অনড়।

খেয়ে দেয়ে যখন বেরিয়েছি তখন প্রায় দুপুর তিনটা হবে। বেরিয়ে দেখি করিম ঠিকই রিকশাওয়ালাকে ঠিকানা বলছে। আমরাও মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লাম ওকে সন্দেহ করেছি দেখে। রিকশা গিয়ে থামলো এক বাড়ির সামনে।

রিকশা থেকে নেমে দেখি করিম আম্মানের কানে কানে কী যেনো বলছে। শুনে আম্মান বলে, "ওরে চো*ন, আগে কবি তো! তুই দরজায় বাড়ি দে যা। আমি কিছু করতে পারব না।"

করিম একটু কাচুমাচু ভঙ্গিতে দরজায় বাড়ি দেয়। এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলেন। করিম সালাম দেয়, "স্লামালেকুম খালাম্মা। রফিক আছে?"

"না বাবা রফিক তো বাসায় নাই। তুমরা কুন্থে আচ্ছো বাবা?"

"আমরা রংপুর থেকে আচ্চি চাচীআম্মা। রফিকের বন্দু", করিম জবাব দেয়।

"অ রফিকের বন্দু তুমরায়? তা আসো আসো ভিতরে আসো", ভদ্রমহিলা আমাদের ভিতরে ডাকেন। আমরা ছয় বান্দর লেজ গুটিয়ে ভিতরে গিয়ে বসি।

"তোমাদের কার নাম কী যেন? অনেকদিন তো, চেহারা মনে আছে। নাম ভুলি গেছি", রফিকের মা জিজ্ঞেস করেন। আমরা পরিচয় দেই। তিনি করিম আর আম্মানকে চিনতে পেরেছেন বলে দাবী করেন।

"চাচীআম্মা সুপ্তী কেমন আচে?", এতক্ষনে করিম গুটি চালে।

"সুপ্তি তো ভালই আচে। এই সুপ্তি কুন্থে গেলি। রফিকের বন্দু করিম, আম্মান এরা আচ্চে। এদিক আয়...", চাচী আম্মা ভিতরের দিকে হাঁক দেন।

এতক্ষণে আসলে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করেছি। করিম আর আম্মানের রফিক নামে একটা বন্ধু ছিলো রংপুরে। তার একটা ছোট বোন ছিলো। কাহিনী তাকে নিয়েই। এই বন্ধুরা পরে দিনাজপুরে চলে আসে। কিন্তু ঠিক কদ্দুর কী সেটা বোঝা যাচ্ছে না এখনও।

সুপ্তির মুখ দেখা গেলো। আমাদের দেখে যারপরনাই অবাক। কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। প্রচন্ড অস্বস্তি নিয়ে "কেমন আছেন" জাতীয় প্রশ্ন করে ভেতরে চলে গেলো। আমাদেরও হঠাৎ করে নিজেদের কেমন যেনো বেকুব মনে হতে লাগলো। বোঝাই যাচ্ছে বিষয়টা ভালো হয়নি।

চাচীআম্মা এসে চা দিবেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা না কোনো দরকার নাই, বাস ধরতে হবে এইসব বলে বেরিয়ে আসলাম। বেরিয়ে এসেই হাফ ছাড়লাম আমরা। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে বন্ধুর বোনটাকে করিম হয়তো পছন্দ করত। মেয়েটাও হয়তো কিঞ্চিত মধুর কথা বলে থাকবে। কিন্তু বিষয়টা কখনই প্রেম বলার মতো গভীর কিছু ছিলো না। পরে তারা সপরিবারে দিনাজপুরে চলে আসলে বিষয়টাও চাপা পড়ে যায়। আমাদের পিয়ার প্রেসারে করিম বেচারাকে এই কান্ড ঘটাতে হয়েছিলো।

এরপর রিক্সা ধরে বাসে ওঠা পর্যন্ত করিম একটা কথাও বলেনি। বাসে ওঠার আগে ছয়টা বেনসন কিনে একটা করিমের হাতে দিয়ে বললাম, "ব্যাপারনা। প্রেমে মরা জলে ডোবেনা।" করিম ফিক করে একটা হাসি দিয়ে সিগারেটটা হাতে নিল।

ব্লগনাম: এস এম মাহবুব মুর্শেদ
বর্তমান অবস্থান: ক্যাননসবার্গ, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল: murshed@gmail.com

জিজ্ঞাসু

সত্যযুগেও সেদিন ছিলো কলিযুগ

ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠেছি। আগে কখনো বাজারের নোটবই পড়িনি। বলতে গেলে বাজারের নোটবই দেখিওনি কোনোদিন। আমাদের সময়ে রেডিও টিভিতে হরদম নোটের বিজ্ঞাপন দিত। কিন্তু আমার যা অবস্থা তাতে ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করার কোনো তাড়া ছিলো না। ইংরেজি ছাড়া আর সব বিষয়েই পাশ করতাম টেনেটুনে অথবা কোনো কোনো বিষয়ে বেশ ভালো ভাবেই। শিক্ষাবোর্ডের নিয়ম শতকরা তেত্রিশ হলেও আমাদের স্কুলের নিয়ম ছিলো শতকরা চল্লিশ নম্বর পেলে পাশ। ইংরেজিতে ফেল করলেও বছর শেষে বিবেচনায় উত্তীর্ণ হয়ে যেতাম পরবর্তী ক্লাসে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করার মতোই ছিলো। কিন্তু হাইস্কুলে ওঠার পর হাইফাই ভাবে ধরেছিলো বলে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বিবেচনায় উত্তীর্ণ হই। সেই সুবাদে এইটে ওঠার পর আমি কিছু নতুন নোটবই পেলাম।

নতুন নোটবই দেখেই প্রথমে এর প্রতি নতুন ভাললাগা তৈরি হলো। নোটবইগুলো একটু বাহারি কাভার সম্বলিত হয় কী না! আগের বছরগুলোতে বছরে তিনটা করে পরীক্ষা হত।

আমাদের শিক্ষকরা এ বছর থেকে দু' টো পরীক্ষার আয়োজন করলেন। এখন থেকে অর্ধবার্ষিক আর বার্ষিক পরীক্ষা হবে। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা দিতে বসেছি। প্রথমেই বাঙলা পরীক্ষা। এতদিন মূল পাঠ্যবই পড়ে এসে পরীক্ষার হলে যাচ্ছেতাই লিখে দিয়ে "তাইরে নাইরে না" করতে করতে বাসায় চলে যেতাম। ক্লাসে খাতা দেখানো হতো তখন ছাত্রদের। আমি পাশ।

কিন্তু আজ নতুন নোটবই খুলে পড়তে একটু অন্যরকম লাগতে লাগলো। ব্যস্। সব প্রশ্নের কেমন যুতসই সব উত্তর হাতের কাছে পাচ্ছি আর পড়ছি। পরীক্ষার দিন সকালে বগলে নোটবইটা নিয়েই চলে এলাম হলে। বারবার নোটবই খুলে খুলে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। ইতিপূর্বে এবং পরবর্তীকালে আজ অবধি আমি কখনো কোনো পরীক্ষার হলে রিডিং ম্যাটেরিয়াল নিতে অভ্যস্ত নই। সেদিন নিয়েছিলাম। পরীক্ষার হলে আমি সর্বদাই কলম-পেন্সিল বক্স আর প্রবেশপত্র নিয়ে বাবুয়ানা স্টাইলে যেতাম।

আমি নতুন নোটবই পড়ছি সেটা আমাদের ক্লাসের শান্তশিষ্ট বালক রিফাত দেখে ফেলেছে। সে তার নিজের বই রেখে আমার কাছ থেকে নোট বইটা নিল। রিফাত বইটা নেয়ার পর আমিও অল্পক্ষণেই বইটার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। যখন আমাদের শিক্ষক দপ্তরিসহ খাতাপত্র নিয়ে হলে প্রবেশ করলেন তখনই মনে হলো নোটবই সহ সমস্ত রিডিং ম্যাটেরিয়াল ব্ল্যাকবোর্ডের নিচে ফ্লোরে রাখতে হবে। আমি রিফাতের কাছে গেলাম বইটা ফেরত নিতে। রিফাত বললো তোর বই রেখে আসছি। আমি নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষা দিচ্ছি।

আমাদের স্কুলে বিকেলে একটা প্রাইভেট ল' কলেজ পরিচালিত হত। লোকে তামাশা করে বলে কেয়ামতের পরে আইনজীবিরা নাকি হরেদরে জাহান্নামের টিকেট হাতে পাবে। কারণ তারা নাকি সবসময় মিথ্যের আশ্রয় নেন। লোকের তাই এমনটা মনে করার কারণ আছে। আমাদের দেশের ল' কলেজগুলোতে কে, কীভাবে পড়াশুনা করে কে জানে! তবে আমাদের স্কুলের যে ল' কলেজ সেখানে তাদের যেদিন পরীক্ষা থাকতো তার পরদিন সকালে আমরা স্কুলে গিয়ে দেখতাম বাথরুমে প্রচুর আইনের (গাইড) বইয়ের অসংখ্য পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত। শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের পরে যেবার প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা হলো সেখানে নাকি নকলে কোনো বাধা ছিলো না। যে যেভাবে পেরেছে পরীক্ষা দিয়েছে।

আজকালকার ক্লাস এইটের ছেলেপিলেরা অনেক তথ্য জানে, যা আমরা তখন জানতাম না। যার ফলে বাথরুমে বইয়ের পাতার মাজেজা বুঝতে আরো কিছু সময় লেগেছিলো। তবে যখন বুঝেছি তখন এটাও বুঝেছি যে কেয়ামতের পরে সব এ্যাডভোকেটেরা যদি জান্নাতের সার্টিফিকেট পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। সবক্ষেত্রে তারা হয়তো একই নিয়মে উৎরে যেতে পারবেন।

সেদিন পরীক্ষা দিতে দিতে একসময় বাথরুম ব্রেক নিয়ে গেলাম বাথরুমে। গিয়েই দেখি আমার নোটবই বাথরুমের কাদাপানিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তখন বইটার প্রতি আমার এত মায়া হলো যে মিস্টার বিন তার প্রিয় গাড়িটি ট্যাংকে মাড়িয়ে দেয়ার পর যেভাবে দুঃখভরা চোখে তাকিয়ে ছিলো, কতক্ষণ বইটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হিসু করা চুলোয় দিয়ে দাড়িয়ে আছি ঠাঁয়। তারপর হাতে নিয়ে বইটার এনাটমি যেই পরীক্ষা করতে যাব চক্ষু ছানাবড়া। রিফাত বইটার অনেক পেজেকটমি করেছে। ছেড়াপাতার সংখ্যা গুণছি এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

আমি দরজা খুলব কী আমি তখন নতুন বইটার অটপসি নিয়ে ব্যস্ত। দরজা আসলে খোলাই ছিলো। আমার সেদিকে খেয়াল নেই। আমাদের রবিনহুড স্যার তখন আমার সামনে রক্তচক্ষু নিয়ে মুর্তিমান সেখানে। টয়লেটের ভিতরে স্যার যাবেন সেটা আমার বাস্তবে বা কল্পনায় কোথাও ছিলো না। স্যার আমাকে ভালো ভাবেই পাকড়াও করলেন। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই। বই সহ। তারপর নিয়ে গেলেন হেডস্যারের রুমে। সেখানে হেডস্যার ছিলেন আর ছিলেন লিটল জন স্যার। ব্যস্ হয়ে গেলো দফারফা। আমি স্যাররা কী কী কথা বলে গজরাচ্ছিলেন তার কিছুই শুনতে পাইনি। তখন আমার চোখের সামনে ফাঁসির দড়ির মতো ভাসতে লাগলো, কাল যখন পরীক্ষা দ্বিতীয় দিনের মতো শুরু হবে তখন পনেরো মিনিট পর থেকেই প্রত্যেক হলে একটা করে নোটিশ চলে যাবে। অমুককে নকল সমেত ধরা হয়েছে। তাকে এক্সপেল করা হয়েছে। তার অন্য সকল পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সে অমুক ক্লাসের অমুক সেকশনের ছাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন স্বীয়কর্ণে শুনতে পাচ্ছি সেই ঘোষণা। নাম- ধাম সহ। কী লজ্জা! কী লজ্জা! এই লজ্জা নিয়ে বাসায় যাব কি করে! ক্লাসের দোস্ত-বন্ধুদেরই বা মুখ দেখাব কি করে! সেই চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় তাকিয়ে দেখি রবিনহুড স্যার নাই।

আমার মাথায় তখন নতুন আইডিয়া ঝিলিক মেরে উঠল। আমি সুযোগ বুঝে লিটল জন স্যারকে বললাম, স্যার আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র আমি এইটের বই দিয়ে কী করবো! আমার সাইজ ছিলো একটু ছোট। লিটল জন বিশ্বাস করলেন, এবং তাৎক্ষণিক আমাকে মুক্তি দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ কইয়া যাচ্ছি পরীক্ষার হলে। দোতলার সিড়ি প্রায় শেষ আর দুই তিন ধাপ বাকি। রবিনহুড আবার গর্জন করে উঠলেন আমার সামনে। তিনি আমার পরীক্ষা বাতিলের জন্য আমার হল থেকে খাতাপত্রসহ নিয়ে এসে পথিমধ্যে হাজির। আমি বললাম স্যার, আমাকে তো লিটল জন স্যার মাফ করে দিয়েছেন। একথা শুনে রবিনহুড সোজা তীর চালিয়ে দিলেন আমার পিঠে। তারপর আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন আবার হেডস্যার ও লিটল জনের সামনে। তারপর বীরদর্পে আমার একটু আগে করা প্রতারণার অসারতা প্রমাণসহ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। লিটল জনকেও বোঝালেন " সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার চপিং উড।"

পরীক্ষা থেকে আমি যথারীতি বহিস্কৃত হলাম। লজ্জায় আর অপমানে বাসায় গিয়ে সেদিন আসলেই মুখ দেখাতে পারিনি।

ব্লগনাম: জিজ্ঞাসু
ইমেইল: mbelal326@yahoo.com

ধুসর গোধূলি

... এবং অবশেষে

জায়গাটা দেখতে অনেকটা কবি জন ডান-এর পিরফোর্ডের বসতের মতো। ছোট্ট একটা লেক মতোন জলার পাশে ছোট্ট একটা বাড়ি। এখানে এলে, এসে বসলেই জন ডানের ভূত মাথায় ভর করে তার। নিউরণে নিউরণে আলোড়ন তোলেন এই প্রেমের কবি। "Each man's death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore, send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee." - মাথার ভেতরে টুংটাং করে বাজতে থাকে। মনেহয় যেনো স্বয়ং ডানই কথা বলে যাচ্ছেন একেবারে মুখের সামনে বসে। জাগতিক প্রেমের সীমানা পেরিয়ে ঐশী প্রেমের সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ করা বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছেন তাকে, প্রিয়ার তরে ব্যক্ত করার জন্য। বুঝিয়ে দিচ্ছেন শাকাহারী প্রেমের তুলনায় স্পর্শিত প্রেমের গাঢ়ত্ব, স্থায়িত্ব, বিশেষত্ব!

কিন্তু আজকে ডানের সঙ্গে কথোপকথন নয়, এ্যাপোলো' র কবিতার বা গানের ঈশ্বরত্ব নয়, জেফিরোস-ফ্লোরার গাঁথা নিয়ে নয় বরং নিজের সাথে বোঝাপোড়া, নিজের ভেতরে, অনেক গহীনে, গভীরে ডুবে কিছু সমীকরণের ডান-বাম পক্ষ মেলানোর জন্যই এখানে আসা। জায়গাটা এজন্য পারফেক্ট। কোনো বাড়তি উপদ্রব নেই। যা আছে তা গাছের পাতায় ফাল্গুনী বাতাসের শনশন শব্দ আর কিছু চেনা-অচেনা পাখির কিচিরমিচির। খুব দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়, হাতেও বেশি অবশিষ্ট নেই। টিক-টিক-টিক...

সময়ের ফ্রেমে স্মৃতির সেলুলয়েডে ধারণকৃত ঘটনাগুলো আবর্তিত হতে থাকে একের পর এক। একেকটা সিক্যুয়েন্স, পর্ব, অংক, দৃশ্য পেরিয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে জীবনের সমীকরণ। একেকবার একেকটা অবয়ব ভেসে চলে আসে সামনে, কিছুক্ষণ থাকে, তারপর মিশে যায় উৎসস্থানে-স্মৃতির উপত্যকায়। কেবল কমন ফ্যাক্টরের মতো একটা মুখ ধ্রুব রয়ে যায়, একটা স্বপ্ন। পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনেও সে নড়ে না, সরেও না। ধ্রুবতারার মতোই একই জায়গায় সে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে যেতে থাকে। কাকচক্ষু দীঘির পানির মতো টলটলে চোখের তার হাসি হাসি মুখে উপচে পড়া গালের টোলটাও মিইয়ে যায় না। নিউরণে চলতে থাকা সমীকরণের সমাধান লাইনগুলো একের পর এক বাড়তেই থাকে। বাস্তবতার ঘাত-কষাঘাতে দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে স্বপ্নের কুটিরের অস্তিত্ব। বুকের ভেতরের ফাঁকা জায়গাটা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। সেখানে বাসা বাঁধতে শুরু করে একটা হাহাকার। সাগরতটে দাঁড়ালে ঢেউয়ের তোরে যেমন করে পায়ের নিচের বালু সরে যায় তেমনি করে ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে সব, সবকিছুই শুধু সেই মুখটা ছাড়া। সবকিছু ভোলানো হাসি হাসি একটা মুখ।

উঠে দাঁড়ায় সে। নিজের জগৎ ছেড়ে চলে আসে লোকালয়ে। "যে কোনো মোবাইলে কল করুণ মাত্র ৪ টাকায়" - ব্যানার দেখে ঢুকে পড়ে একটা দোকানে। সবচেয়ে কাছের বন্ধুর মোবাইল নাম্বার ডায়াল করে। "আমি দেখতে চাই কী আছে এই প্রপাতের শেষে!" বন্ধু কী বলে আমরা জানি না। সে অপেক্ষা করে বন্ধুটি আসা পর্যন্ত। বন্ধু এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। কাঁধে আলতো ঝাঁকি দিয়ে বলে, "দ্যাটস দ্য স্পিরিট বাডি!" তাদেরকে নিয়ে সাদা রঙের করোলা ছুটে চলে শহরের অভিজাত এলাকার দিকে। সেখানে তার স্বপ্নের সাথীর আজ বাগদানের পর্ব। আমরা জানতে পারিনা নিউরণের সমীকরণের সমাধানের চেয়ে হৃদয়ের আবেদন কতোটা গ্রহণযোগ্য হবে তার আত্মার আত্মীয়' র কাছে! সে-ই বা পারবে কিনা শতশত প্রথাগত "সফল" মানুষের সামনে প্রথাগত "অসফল" নিজের স্বপ্নের কথাগুলো নির্বিঘ্নে ব্যক্ত করতে!

ব্লগনাম: ধুসর গোধূলি
বর্তমান অবস্থান: জার্মানি
ইমেইল: dhushorgodhuli@gmail.com

মাশীদ আহমদ

গুডবাই চিঠি

বিকেলের দিকে আরেকটা ইমেইল পেলাম। অফিসের সবাইকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ইংলিশ থেকে বাংলা করলে মেইলটা অনেকটা দাঁড়ায় এরকম:

এই অফিসে আজকে আমার শেষ দিন। অনেক দুঃখের সাথে তোমাদের সবাইকে আমি বিদায় জানাচ্ছি আজ। গত তিন বছর এই অফিসে আমার অনেক আনন্দে দিন কেটেছে। অনেক কিছু অর্জন করেছি এই অফিসে কাজ করে। কিন্তু চলে যেতে হচ্ছে কারণ নিজেকে প্রসার করার আরো বড় সুযোগ এসেছে তাই। এতদিনের সহযোগিতার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আর আমার এতদিনের ভুল-ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার সাথে যোগাযোগ রেখ। যোগাযোগের ঠিকানা: ...@hotmail.com।

গুডবাই।

পাশে বসা ড্যানিয়েল ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, দেখেছ, জ্যাকিও চলে যাচ্ছে। তুমি জানতে আগে?

- না।

- পরপর অনেকেই চাকরি ছেড়ে চলে গেলো এই শেষ ক' মাসে, না? গত পরশুই না ফাইন্যান্সের মার্কো' র গুডবাই মেইল পেলাম!

- হ্যাঁ। খুবই খারাপ লাগছে। তবে অনেক ভালো স্কোপ পাচ্ছে বলেই যাচ্ছে। So I'm happy for them.

আমি আর কথা না বাড়িয়ে আবার কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে মন দেই। সকাল থেকে একগাদা কাজ জমে আছে। তার উপরে অতি স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের গুলির মতো চারিদিক থেকে শ' য়ে শ' য়ে ইমেইল আসছে।

"গত পরশুর সিস্টেম কল্যাপ্স করার মেইন কারণ কি ছিলো?"

"ঐ যে এত তারিখ ঐখানে নেটওয়ার্ক ডাউন ছিলো, সেটার কারণ কী নেটওয়ার্ক টিম জানিয়েছে?"

"গত সপ্তাহের টিম মিটিং এর মিনিট কই?"

"আজকে একটু আগে আবার সার্ভার অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না, একটা হাই প্রায়োরিটি কেইস লগ করা হয়েছে, প্লিজ কাস্টমারদের ১৫ মিনিটের মধ্যে সেটা নিয়ে আপডেট দাও।"

"এইখানে কাজের এখনকার প্রসেস ফ্লো আর সেটা ইম্প্রুভ করার জন্য কী কী করণীয় সে ব্যাপারে তোমার থেকে যে রিপোর্টটা গত মাসে ড্যু ছিলো, সেটা কি কালকের মধ্যে দয়া করে পাওয়া যাবে?"

"প্লিজ আর কতোবার তোমাকে বলে দিতে হবে কাস্টমারদেরকে এইভাবে মেইল করা যাবে না? আরো অনেকে রেখে-ঢেকে বলতে হবে?"

"আর কতোবার তোমাকে বলে দিতে হবে যে ওই কোম্পানী আমাদের কাস্টমার, তাই তাদের সাথে কোনো খাতির নাই, স্রেফ টাইটের উপরে রাখবে?"

"কোন বুদ্ধিতে আমাদের কাউকে লুপে না রেখে তুমি একাই এই সমস্যার সমাধান করেছ?"

"অনেকবার বলা হয়েছে তোমাকে, ম্যানেজার হিসেবে তোমার দায়িত্ব তোমার অধীনে যারা কাজ করছে তাদের থেকে কাজ আদায় করা, তাদের অনুভূতি নিয়ে ভাবা নয়... customers don't care about yours or your team's feelings..."

এরকম অনেক অনেক প্রশ্ন এসে জমা হয় আমার সামনের স্ক্রিনে। প্রতিদিন। একবার কোনো এক বন্ধুর মুখে জানি একটা কথা ঠাট্টার ছলে শুনেছিলাম – "চারিদিকে শত্রুর দল, করিতেছে কোলাহল।" ছন্দটা শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম মনে আছে। কর্পোরেট অফিসে টিপিকাল কর্পোরেট বস্ আর আশে-পাশে এর-ওর ঘাড়ে নিজেদের দোষ চাপানোর জন্য বসে থাকা মানুষের সাথে চাকরি করতে না এলে এই লাইনটা হয়তো ঠাট্টাই

ভেবে যেতাম আজীবন। স্বার্থের জন্য কতো চট করে নিজের ভোল পাল্টে ফেলা যায়, সেটাও দেখা হতো না হয়তো কোনোদিন। আর শুধু দেখে বসে থাকলেই যদি চলে যেতো তাহলেও কথা ছিলো, নিজের পিঠের চামড়া বাঁচিয়ে এই দুনিয়ায় এই যুগে টিকে থাকতে হলে আমাকেও ওদের মতই হতে হবে। হাজার হোক জ্ঞানী-গুণীরা বলেছেন - "বাঁচতে হোলে জানতে হবে।"

সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে যায়। প্রতিরাতেই।

বাড়ি ফিরে ফেইসবুকে সবার রঙ-বেরঙের জীবন দেখি অথবা টিভিতে নানা রিয়্যালিটি শোগুলোতে মানুষের রঙ-বেরঙের স্বপ্ন দেখি। রাতটাকে টেনেটুনে অনেক লম্বা করার চেষ্টা করি যেনো পরের দিনটা হুট করে চলে না আসে। চলে আসলেই আবার আরেকটা দিনের শুরু। আরো শ' খানেক ইমেইল।

বিছানায় শুয়ে মনে মনে আমি প্রতিরাতে একটা ইমেইলের ড্রাফট লিখি, ইংলিশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় অনেকটা এরকম -

"এই অফিসে আজকে আমার শেষ দিন। অনেক আনন্দের সাথে তোমাদের সবাইকে আমি বিদায় জানাচ্ছি আজ। গত তিন বছর এই অফিসে আমার দিন কেটেছে গভীর দুঃখ আর হতাশায়। তোমাদের নানা ক্যাচাল আমার ঘাড়ে নিতে নিতে আমি ক্লান্ত। আজ চলে যাচ্ছি কারণ অবশেষে এসব থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার একটা সুযোগ এসেছে তাই। এতদিনের অসহযোগিতার জন্য তোমাদের সবাইকে ধিক্কার। আর তোমাদের এতদিনের ভুল-ত্রুটি আর অবিবেচকের মতো আচরণের জন্য আমি তোমাদের ক্ষমা করতে আগ্রহী নই, যদিও জানি তাতে তোমাদের কিছুই এসে যায় না, অতটুকু সূক্ষ অনুভূতি অনেক আগেই জলাঞ্জলি দিয়েছ। তোমাদের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রশ্নই আসে না তাই ভুলেও আমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা কর না। আজই হোক তোমাদের সাথে আমার শেষ মোলাকাত। তোমরা দোযখের আগুনে পোড়ো আর আমার পশ্চাৎদেশে চুমু খেতে পারো। গুডবাই।"

এই মেইলটা মনে মনে লিখে ফেললেই আমার খুব শান্তি শান্তি একটা ভাব চলে আসে। মাঝেমাঝে ঘুমের মধ্যে খুব ভালো স্বপ্নও দেখে ফেলি। এই যেমন গতকাল দেখলাম আমার বসের সাথে ফুটসল খেলছি। খেলতে খেলতে এক মোক্ষম সুযোগে দিলাম ফাউল করে। আর হাড়-বদমাইশ বস্ ব্যাটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। পরের সিনেই দেখলাম ব্যাটা ফোকলা দাঁতে হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে, ইংলিশ কমেডি সিনেমার মতো ব্যান্ডেজে বাঁধা হাত-পা চারিদিকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাথে লটকে আছে। (উল্লেখ্য যে আমি বাস্তবিক জীবনে না খেললেও আমার বস্ প্রায়ই ফুটসল খেলেন এবং মাঝেমাঝে জরুরী ক্যাচাল আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে অফিস ফাঁকি মারেন খেলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পাবার অজুহাতে। গতকাল তেমন একদিন ছিলো। অবচেতন মনের স্বপ্নে সেটাই হানা দিয়েছিলো হয়তো।)

যাই হোক, সকালে ঘুম থেকে উঠি যতটা দেরীতে সম্ভব। রাতকে শেষ করায় যেমন অনিচ্ছা আমার, দিন শুরু করাতেও ততটাই। গভীর অনিচ্ছায় অফিসে যাই। মেশিন থেকে একটা কফি নিয়ে আবার কম্পিউটার খুলে বসি। আবার নিজেকে দাঁড় করাই ইমেইল ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।

তবে দিনের শেষে আবার মনে মনে লিখে ফেলি আরেকটা "গুডবাই" চিঠির খসড়া। আমারো দিন আসবে, ঠিকানার ঘরে অফিসের সব স্টাফের কমন গ্রুপের ঠিকানা টাইপ করে "Send" বোতামটা ঠিক ঠিক ক্লিক করে সবার চোখের সামনে দিয়ে গটগট করে ডাটসে বেড়িয়ে যাব একদিন এই কর্পোরেট ঝলমলে মিথ্যে দুনিয়া থেকে। তবে এখনকার মতো মনের গোপন স্ক্রীনেই লেখা থাক সেই চিঠি। পাশে বসা ড্যানিয়েলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা হাসি দেই আর কম্পিউটার স্ক্রীনে লিখি, প্রিয় ড্যানিয়েল, তোমার কাছে সেই বিষয়ে আপডেট চাইতে চাইতে আমি ক্লান্ত। কালকের মধ্যে কোনো আপডেট না পেলে...।

ব্লগনাম: মাশীদ
বর্তমান অবস্থান: কুয়ালা লামপুর, মালয়শিয়া
ইমেইল: masheed.ahmad@gmail.com

কীর্তিনাশা

আমার ঘর ছাড়ার গল্প

ছোটবেলায় একবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কেনো বেরিয়েছিলাম তা এখন আর মনে নেই পুরোপুরি। তবে এটুকু মনে আছে সেদিন বুকের ভেতর একটা তিব্র কষ্ট কাজ করছিলো। মনে হচ্ছিলো এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। কেউ আমার কথা ভাবে না। আমি ঘর ছাড়লে শুধু নয়, মরে গেলেও এ পৃথিবীর কারো কিছু আসে যায় না।

তখন আমি ক্লাস সিক্সে কি সেভেনে পড়ি। সম্ভবত বাবা সেদিন আমাকে খুব বকাঝকা করেছিলেন কোনো কারণে। মা আর বোনেরাও কোনো সহানুভূতি দেখায়নি। তাই দুপুর বেলা সবাই যখন ভাত খেয়ে একটু শুয়েছে, সেই ফাঁকে এক বুক ভরা বেদনা নিয়ে আমি পথে বেড়িয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য যেদিকে দু' চোখ যায় সেদিকে যাওয়া।

তখন আমাদের বাসা ছিলো ফার্মগেটের তেজতুরী বাজারে। সে পাড়ার খুব কাছেই রেললাইন। প্রতিদিন বিকেলে সে রেললাইনে হাঁটতে যেতাম আমি বন্ধুদের সাথে। রেললাইনের একটা পাতের ওপর দিয়ে না পড়ে একটানা কতদূর হেঁটে যাওয়া যায় তার প্রতিযোগিতা করতাম।

ঘর ছেড়ে প্রথমেই আমি সেই রেললাইন ধরে হাঁটা শুরু করলাম। মনের ভেতর প্রচন্ড জেদ - মরে গেলেও আর ঘরে ফিরে যাবো না, এই হচ্ছে প্রতিজ্ঞা। রেললাইনের একটা পাতের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আপন মনে। পকেটে একটা টাকা ছিলো না। কোথায় যাবো কার কাছে থাকবো সে কথাও ভাবিনি। আমার কেবল একটাই ভাবনা ঘরে আর ফিরবো না। যে ঘরের কেউ আমাকে ভালোবাসে না, আমার কথা এতটুকু চিন্তা করে না সে ঘরে আমি থাকবো না।

দুখু মিয়ার কাহিনী পড়া হয়ে গেছে তার আগেই। তাই ভাবছিলাম - কবি নজরুল যদি ঘর পালিয়ে এত বড় কবি হতে পারেন, তবে আমি কেনো পারবো না। আমিও বেঁচে-বর্তে ভালোই থাকবো।

এসব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে কখন মহাখালি রেলক্রসিং পার হয়ে গেছি লক্ষ্যও করিনি। হাঁটছিলাম তখনো হন-হন করে। বনানী রেলস্টেশনের কাছাকাছি আসার পরে মনে হলো - আচ্ছা আমি চলে গেলে আসলেই কি সবাই ভালো থাকবে? আমার মা কি সত্যিই আমার কথা ভুলে যাবে?

আরো কিছু দূর যাবার পরে হঠাৎ আমি যেনো চোখের সামনে দেখতে পেলাম - আমাকে হারিয়ে আমার মা কপাল চাপড়ে কাঁদছেন। যেভাবে কেঁদেছিলেন আমার নানা মারা যাবার পরে। তারপর হয়তো দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজের মাথা ফাটাবেন।

একথা ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ঘর ছেড়ে চলে এসে আমি হয়তো ভালোই থাকবো, কিন্তু আমার মা তো প্রচন্ড কষ্ট পাবেন। হয়তো আমার কথা ভেবে ভেবে মরেই যাবেন। এ চিন্তা যখন মাথায় ঢুকলো তখন আমি আর দেরি না করে উল্টো দিকে ফিরে হাঁটা শুরু করলাম। মা কষ্ট পাবেন বা তার ক্ষতি হবে এ ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না।

বাসায় যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাবা তখনো বাসায় ফেরেননি। আমি গিয়ে বাসার দরজায় দাঁড়াতেই মা দরজা খুললেন। যেনো তিনি আমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন - কোথায় গিয়েছিলি? আমি কোনো কথা না বলে ভেজা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তাতে তিনি কী বুঝেছিলেন জানিনা। কিন্তু তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ জড়িয়ে রেখেছিলেন। এতটুকু বকেননি । শুধু বলেছিলেন - আর কোনোদিন এরকম করবি না।

আমার বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা আমি কাউকে বলিনি আজ পর্যন্ত। মা' কেও বলিনি। কিন্তু আমার ধারনা তিনি সেদিন তা বুঝতে পেরেছিলেন।

সেদিন আমি নতুন করে বুঝতে পেরেছিলাম - আর কেউ না থাকলেও আমার মা আছেন। আমার পরম আশ্রয় ও আস্থার স্থল।

সেই মা আমার পৃথিবী ছেড়েছেন আজ দু' বছরের অধিক সময় হয়েছে। বাবা চলে গেছেন তারো আগে। বোনেরা সব যার যার ঘর-সংসার নিয়ে ব্যাস্ত। আমিও ব্যাস্ত নিজের ঘর গোছাতে আর জীবিকার পেছনে ছুটতে। তবে মায়ের কথা ভুলতে পারিনা। নিজের পরম ভরসার আশ্রয়টুকু বিলীন হয়ে যাওয়ার কষ্ট কুরে কুরে খায় আমাকে প্রতিটা ক্ষণ।

এখনো মাঝে মাঝে যখন জীবনের টানা-পোড়ন সইতে পারিনা, বিষাদ উথলে ওঠে মনের ভেতর তখন আবার সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। তবে ঘর ছেড়ে নয়, পুরো জীবন থেকেই ছুটি নিতে ইচ্ছা হয়।

আবার এমনো মনে হয় - একেবারে মরে না গিয়ে যদি এমন ব্যবস্থা থাকতো যে কিছু দিনের জন্য মরে যাওয়া যাবে, এক মাস, ছ' মাস অথবা এক বছর। তবে কিছু দিনের জন্য মরে গিয়ে আমার মায়ের কোলে প্রান ভরে ঘুমিয়ে আসতাম। মনের ভেতর জমে থাকা সব জ্বালাগুলোকে একটু জুড়িয়ে আসতাম। তারপর আবার নব উদ্যমে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

কিন্তু হায় এত হবার নয় কোনোদিন!

ব্লগনাম: কীর্তিনাশা
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: nazrul27@gmail.com

আশেক ইয়ামিন

অপরাধী

তখন বোধহয় ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। সবে শুরু করেছি। লিভিংরুমে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে গল্পের বই পড়ছি এমন সময় গেটে শব্দ হলো। গিয়ে দেখি ছেঁড়া জামার জীর্ণশীর্ন এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে যন্ত্রপাতির একখানা ছোট বাক্স। বাক্সের চেহারা তার মালিকের প্রকৃত অবস্থার জানান দিচ্ছে। চেহারায় দারিদ্রের ছাপের সাথে আর যে জিনিসটি প্রকট হয়ে আছে তা তার হতবিহ্বলতা আর অসহায়ত্ব। লোকটি ভাঙ্গা হাঁড়ি মেরামত করে। হাঁড়ির যে অংশটি ধরে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনা নেয়া করি সে অংশটি ছুটে গেলে তা সে মেরামত করে দেয়। আমরা হাঁড়ি সারাতে (মেরামত) চাই কিনা জানতে চাইলে আমার উত্তর স্বভাবতই "না" ছিলো। এই শিল্পায়নের যুগে ধাতুর তৈজসপত্রের দাম যেভাবে কমে এসেছে তাতে কিছু ভেঙ্গে গেলেও সারানোর চেয়ে নতুন একটা কিনে নেয়াটা অনেক বেশি সহজ। আর সেদিন আসলে সারানোর মতো তেমন কিছু আমাদের ছিলোওনা। লোকটির চেহারা দেখে আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো কোনো একটা কাজ দিতে কিন্তু কিছু না থাকায় তাকে হতাশই করতে হল।

লোকটি চলে যাচ্ছিলো কিন্তু এর ঠিক পরেই যা ঘটলো তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। লোকটি একটুখানি গিয়েই ফিরে এসে বলল "বাবা আমারে একটু ভাত দেবেন?"। সেদিন ঐ মুহূর্তে আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিলো তা হয়তো আমি কখনই কাউকে বোঝাতে পারবনা। মনে হচ্ছিলো আমার ভেতরটা কেউ যেনো দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। একটা স্টীমরোলার যেনো আমার হৃৎপিন্ডের উপর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে আসা যাওয়া করছে। আমি ভাবছিলাম দারিদ্রতা আর ক্ষুধার তাড়না কোথায় পৌঁছালে একজন মানুষ যে সম্মানজনকভাবে জীবিকা অর্জন করে বেঁচে

থাকতে চায়, সে একবেলা ভাত খাবার জন্য হাত পাততে পারে!! কী তীব্র দারিদ্রতায় তাকে সেদিন তার আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে আমার কাছে ভাত চাইতে হয়েছিলো! সেদিনের সেই লোকটির নিজের কাছে নিজের পরাজয়ের চিত্রটি আমার কাছে এত তীব্রভাবে ফুটে উঠেছিলো যেনো মনে হচ্ছিলো আমিই সেই লোকটি এ যেনো আমারই পরাজয়!

আমি সেদিন তাকে শুধু ভাতই খাইয়েছিলাম। একবারও জিজ্ঞেস করিনি তার সংসারে আর কে আছে, কিভাবে তার দিন চলে, সামনের দিনগুলোর ভাত সে কোথা থেকে জোগাড় করবে। তখন চিন্তাভাবনাগুলো এত পরিণতও ছিলো না, কিছু করার সামর্থও ছিলো না আর ঘটনার প্রচন্ডতা আমাকে কেমন যেনো বিমুঢ় করে দিয়েছিলো। আমাদের চারপাশে ভিক্ষুকের চাইতে এইসব চুপ করে মুখ-বুঁজে দারিদ্রতা বয়ে বেড়ানো মানুষের সংখ্যা হয়তো অনেক বেশি! কিন্তু কী করেছি আমরা মানুষ হিসেবে তাদের জন্যে? এই প্রশ্ন যখন নিজেই নিজেকে করি, আমি নিরুত্তর থাকি।

আমার বাড়ির পাশের রাস্তার যে ফেরিওয়ালাটি তার সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে হাতেগোনা কিছু লেবু অথবা কালো দাগ পড়া শীর্ণ কলা ঝুড়িতে নিয়ে বিক্রি করতে বসে, কখনো কী তার চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি তার উদাস দৃষ্টির পিছনে কী কথা লুকোনো আছে? একবারও কী ভেবে দেখেছি আজ যদি তার লেবু অথবা কলা গুলো বিক্রি না হয় তবে কী নিয়ে সে তার পথ চেয়ে বসে থাকা ভালোবাসার স্ত্রী আর আদরের সন্তানের কাছে ফিরে যাবে? আমাদের যে ফেলে দেয়া সন্তানেরা তাদের ঘাড়ের ঝোলায় বাতিল আর ময়লা আবর্জনার সাথে নিজেদের জীবনটাকেও বয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাদের শুকনো, রুক্ষ মুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রচন্ড অভিমান, রাগ, দুঃখ আর ক্ষোভের যে অভিব্যাক্তি আর চোখের গভীরে লুকিয়ে থাকা নিদারুণ অসহায়ত্ব আর করুণা লাভের আকাঙ্ক্ষা কী কখনো বুঝতে চেয়েছি? অথবা সেই লোকটি যে প্রতিদিন ঝুড়ি হাতে রাস্তার মোড়ে উপস্থিত হয় নিজের শ্রম বিক্রি করার জন্যে আর আশা নিয়ে চেয়ে থাকে কে এসে তাকে কিনে নিয়ে যাবে - তার কথা কয়দিন ভেবেছি?! হায় শীর্ণ দেহের লোকটি কয়দিন নিজেকে এভাবে বেচতে পারে? যেদিন কেউ তাকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে যায়না সেদিন তার মনের খবর কবে আমরা জানতে চেয়েছি?

আরেকদিনের ঘটনা - খালাত ভাইয়ের সাথে গিয়েছি তার জন্য কম্পিউটার কিনতে। সব কিছু করা শেষ, আমি বেরিয়েছি স্কুটার বা রিক্সা খুঁজতে। একটু এগিয়েই দেখি এক অতিশীপর বৃদ্ধা একটা বাড়ির বন্ধ অব্যবহৃত গেটের সামনে পোটলা নিয়ে বসে আছে, চোখে ঠিক মতো দেখে না। আমি এগিয়ে গেলাম ক' টা টাকা দেবার জন্যে। টাকা দেবার জন্য যখন হাত বাড়িয়েছি বৃদ্ধা আমার হাতটি খপ করে ধরে বললেন "এ ভাই, এটা আম খাওয়া।" আমের সময় তখন প্রায় শেষ। যেসব আম তখন দোকানে পাওয়া যায় তার দাম অনেক, ছাত্র মানুষ অত টাকা তখন পকেটে নাই। বড়জোর একটা আম হয়তো কেনা যায়। কিন্তু একটা আম কিনতে কেমন দেখাবে সে লজ্জায় আম কেনার চিন্তা বাদ দিলাম। মনেমনে বললাম "হায় আম!" বৃদ্ধাকে শুধু বলে এসেছিলাম "এখন আম কোথায় পাব?" আর নিজেকে বললাম "ধিক্ তোর লজ্জা!"

পরের দিন ফিরে গিয়েছিলাম তাকে আম খাওয়াতে, কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাইনি। হয়তো তখন সে আশ্রয় নিয়েছে অন্য কোনো ক্রোরপতির অব্যবহৃত গেটের সামনে কিংবা কে জানে পরম করুণাময়ের করুণার ক্রোড়েই হয়তো তার আশ্রয় হয়েছে। আমি ফিরে আসলাম নিতান্ত এক অপরাধীর মত।

ব্লগনাম: নির্বাক
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: nirbaak08@gmail.com

হাসান মোরশেদ

নদীবর্তী রূপকথা

আর তুমি ঘুমের ভেতর একটা নদী হয়ে উঠেছিলে।

সেই নদীর গল্প তো বলেছিলাম তোমাকে। শুনেছিলে, তারপর ভাসিয়ে দিয়েছিলে হাওয়ায় - যেমন ভাসিয়ে দিতে তুমি আমার কাতরতা, আমাদের বুনন সেই সবুজ সন্ন্যাস কালে।

ভাসতে ভাসতে হাওয়ার জল গিয়ে মিশেছিলো নদীতে। সে নদীর নাম ছিলোনা কোনো। বাড়ি ছিলো তার ঐ দূর, আরো দূর, বহুদূরের মেঘ পাহাড়ের দেশে। রঙধনুকের সাতটি কলা সেখানে নেচে উঠতো আহ্লাদী এক বনবেড়ালীর মতো আর থোকা থোকা মেঘ! মেঘেদের ঘর। মেঘের মতো কোমল মেয়েরা থোকা থোকা ঘ্রানময়।

তবু দেখো, মেঘেদের হাত ধরে নিরুদ্দেশ হইনি সেইকালে। বৃষ্টির সম্ভাবনায়, প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনায় কেমন বোকা বোকা দাঁড়িয়েছিলাম ঘন নীল অরন্যের গভীরে- একা। বৃষ্টি নামবে সমতলের দেশে, মেঘেরা দূরে যাক- আলিংগনে জড়াবো বৃষ্টিময় মুগ্ধতা।

কোনো কোনো পুরুষ সবুজ চেনেনা- নীল অরন্যের গভীরে তারা হারায় স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। আহা বৃষ্টি কবে ঝরে গেলো, কবে বৃষ্টিজল মেঘ হয়ে ফিরে এলো - সেই মেঘ থোকা থোকা থমকে দাঁড়ালো নামহীন এক পাহাড়ী নদীর ঢালে - একাকী আরণ্যক জানলোনা বার্তা সেই।

কেবল মালিয়া তারিয়াং, পাহাড়ের মেয়ে নদীর জলে হাত ভিজিয়ে শুশ্রুষা নিবেদন করেছিলো।

তার সিংহীর মতো কোমর, বুকের উর্বরতা, শরীরের শস্যঘ্রান ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারতো গ্লানিমা যতো। একবার সেই মাটির মোহরে ঠোঁট ছুয়ালে ফুরিয়ে যেতো প্রসিদ্ধ প্রাসাদের ফেরার অভিলাষ।

হায়, সেই রুপকথার রাতে নদীটা অতোটা চাবুক না হলেই পারতো। তোমার ঘুমের ভেতর জেগে উঠা সেই নদী, ঘুমের ভেতর সেই তুমি হয়ে উঠা নদী।

ব্লগনাম: হাসান মোরশেদ
বর্তমান অবস্থান: স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য
ইমেইল: hasan_murshed@hotmail.com

অমিত আহমেদ

একটা চাকরি হবে?

১

এইচএসসি শেষে বাবা আমাকে পাঠালেন শ্যামলী ড্রাইভিং স্কুলে।

গাড়ি মোটামুটি চালাতে জানতাম কিন্তু লাইসেন্স ছিলো না। বাবার কথা হলো, "বাসায় বসে না থেকে সময়টা কাজে লাগা, একটা লাইসেন্স নিয়ে নে!" আমার খুব একটা আগ্রহ ছিলো না।

প্রথমত, বাসায় আমি মোটেই বসে থাকতাম না। রুটিন করে দোস্ত সমাজের সাথে আড্ডা দিতাম। ছোটো ভাইয়ের সাথে ফিফা-নাইনটিনাইন খেলতাম। মেয়ে বন্ধুদের সাথে বিগ বাইট, হট-হাট, চিনা রেস্তোরায় টাকা ওড়াতাম। কোনো রক কনসার্ট বাদ দিতাম না। ধুমিয়ে গল্পের বই পড়তাম। ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে হুদাই সাদা-কালো সিনেমা দেখতাম। সুযোগ পেলেই ঢাকার বাইরে ভ্রমন লাগাতাম। আর এসবের ফাঁকে সময় পেলে ভার্সিটি ভর্তির জন্য একটু বই নাড়া-চাড়া করতাম।

দ্বিতীয়ত, লাইসেন্স নেবার জন্য ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হবার কী দরকার সেটা আমার মোটেই বোধগম্য নয়। আমার ক'জন বন্ধু খুব সহজেই "টাকার বিনিময়ে লাইসেন্স কর্মসূচি"র আওতায় লাইসেন্স নিয়ে নিয়েছে। আমাকে কেনো এতো ঝামেলা করে গাড়ি চালাবার সনদ নিতে হবে?

তবে বাবার নির্দেশে খুব কমই "না" বলা যায়। আমি তাই একদিন পকেটে নিবন্ধন ফি নিয়ে শ্যামলী ড্রাইভিং স্কুলের দিকে রওনা দিলাম। স্কুল আমাদের বাসা থেকে খুব দূরে নয়। থাকতাম মিরপুর পীরের বাগে; সেখান থেকে রিক্সা নিয়ে গলি-ঘুপচির ভেতর দিয়ে আধা ঘন্টাতেই স্কুলে চলে যাওয়া যেতো। ভর্তি হবার সময় জানা গেলো, দুই ধরণের সিস্টেম আছে। একক কিংবা দলবদ্ধ। একা হলে আলাদা গাড়িতে প্রশিক্ষকের একান্ত তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন এক থেকে দুই ঘন্টা শেখানো হবে। দলে হলে একই গাড়িতে চারজনকে শেখানো হবে। আমার মিছিল করে গাড়ি চালানো শেখার কোনো ইচ্ছে ছিলো না। আমি মোটা অংকের ফি দিয়ে একক প্রশিক্ষণে নিবন্ধন করে ফেললাম। ওইদিনই টুকিটাকি মেশিনারী শিক্ষা আর একটা পুস্তিকা দিয়ে দেয়া হলো। আগামী হপ্তা থেকে ব্যবহারিক শিক্ষা।

যেহেতু বাসা থেকে বের হয়েই রিক্সা নিতাম, আমি জামা বদলাতাম না। ঘুম থেকে উঠে নাশতা করেই বেরিয়ে পড়তাম। বাসায় এসে চান করে এরপরে অন্য কোথাও যেতাম।

প্রথমদিনই স্কুলে একটা খুব বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেলো।

আমি গিয়ে অপেক্ষা কামরায় বসে আছি। প্রশিক্ষক নাকি এখনো আসেননি। আসলেই রওনা দেয়া হবে। কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। চুপচাপ বসে পুরানো "আনন্দবিচিত্রা" পড়ছি। এমন সময় মধ্য ত্রিশের এক ভদ্রলোক এলেন। বেশ ফর্মাল জামা-কাপড়। আয়রন করা শার্ট-ট্রাউজার। চকচকে চামড়ার জুতো। উনি এসেই হই-হুল্লোড় শুরু করে দিলেন, "হোয়াট ইজ দিস? সাত্টার সময় আসতে বলসে, এখন বাজে সোয়া সাত্টা। আমার অফিস নয়টা থেকে। কোথায়? স্টুপিড ড্রাইভার কোথায়?"

স্কুলের সবাই খুব অস্থির হয়ে গেলো। "ভাই এখনি চলে আসবে। আপনি বসেন। ওই স্যারকে চা দে। স্যার আপনি বসেন।"

ভদ্রলোক একটু ঠান্ডা হয়ে আমার পাশে বসেন। আমাকে যাচাই করে তার মনে হয় বেশ "সভ্য"ই মনে হয়। তবুও জামা-কাপড়ের সন্দেহ দূর করতে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি গ্রুপে? নাকি একা শিখবেন?"

"একা।"

উনি নিশ্চিত হয়ে যান। খুব আগ্রহ নিয়ে বলেন, "দেখসেন ভাই এদের কারবারটা দেখসেন? বল্লো শার্প সাত্টার সময়, সোয়া সাত্টার বেশি বাজে এখনো ড্রাইভারের খোঁজ নাই।"

"বাংলাদেশের টাইম। বোঝেনই তো।"

"টাকা নেওয়ার সময় কোনো ছাড় দিসে? বলেন? কতো টাকা নিসে খেয়াল আছে?" উনি রাগ দেখিয়ে বলেন।

আমি হাসি। কোনো জবাব দেই না।

প্রশিক্ষক আসেন আরো দশ মিনিট পরে। ভদ্রলোক তখনো চিল্লান, "হেই, হেই? হেই মিয়া! তুমি এতো দেরি করে আসলা... কী ব্যাপার্টা কী? নবাব? কী নবাবী পাইসো?"

প্রশিক্ষক ভদ্রলোক কী বলবেন বুঝে পান না। আমতা আমতা করে বলেন, "স্যার, বাস পাইতেসিলাম না।"

কোনো অজুহাতই ভদ্রলোকের মনে ধরে না। তিনি চেঁচিয়েই যান।

তার হইহল্লা শেষে বাইরে এসে দেখি কাহিনী খারাপ। বাইরে সিঁড়িতে আরো তিনজন বসে আছে। ওরাও নাকি আমাদের সাথে যাবে। তিনটা গাড়ি থাকলেও আজ প্রশিক্ষক নাকি এই একজনই। তাই সবাইকে একসাথে শেখানো হবে।

এবার আর ভদ্রলোককে পায় কে। উনি রাগে লাফাতে লাগলেন।

"হেই স্টুপিড। তোমরা না বলসিলা একজনকে আলাদা করে শেখানো হবে? এসব কী? এইসব বস্তির পোলাপাইনের সাথে আমি গাড়িতে উঠবো? নেভার! হেই... হেই আমার টাকা ফেরত দে। আর তোদের বিজনেস আমি বন্ধ করতেসি... চিনস না... চিনস না তো আমারে!"

স্কুলে পরিচালক (যিনি নতুন শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেন) খুব বিভ্রান্ত হয়ে যান। আমতা আমতা করে বলেন, "শুধু আজকের জন্য স্যার। আজ তো উনি শুধু আপনাদের চালিয়ে দেখাবেন। কালকে থেকেই..."

এ কথায় তার মন ভরে না; হাউমাউ করে বলতে থাকে, "এসব ফকিরের বাচ্চাদের সাথে গাড়িতে উঠবো না।"

সব ছাড়িয়ে আমার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি তিনজন ছাত্রের দিকে চোখ চলে যায়। তিনজনই আমার কাছাকাছি বয়সের। চেহারায় দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। সস্তা জামা-কাপড় পরা। পায়ে লাল-নীল ফিতার স্যান্ডেল। নিনাদরত মানুষটার করা অপমানে তাদের মুখে কোনো প্রতিবাদের রেখা জাগে না। বরং চোখ কেমন ছলছল করে ওঠে। আমার খুব খারাপ লাগে। আমার মনে হয় ওদেরকে কিছু বলি। কিংবা লোকটাকে কষে একটা চড় লাগাই। কিন্তু কিছুই করা হয় না।

লোকটার সাথে পরিচালকের রফা হয় - প্রশিক্ষক তাকে একাই নিয়ে যাবে। দলে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে যাবে পরিচালক। আগামীকাল থেকে অন্য দুই প্রশিক্ষক এলে আর এই সমস্যা হবে না। এ কথায় লোক একটু শান্ত হয়। ছেলেগুলো মাথা নিঁচু করেই থাকে; একবারো মুখ তুলে চায় না।

প্রশিক্ষক গাড়ি নিয়ে আসলে লোকটা গাড়ির পেছনের দরজা খুলে আমার দিকে তাকায়, "আরে আসেন! উঠে পড়েন।"

"আপনি না একা শিখবেন?"

"আরে ভাই আমি তো ওই ওদের কথা বলসিলাম। আজকে তো আর ড্রাইভার নাই। আপনি আমার সাথে আসেন।"

"না।"

"জ্বী?"

"আপনার সাথে আমি গাড়িতে উঠবো না। আপনি লোক ভালো না।"

উনি এমন অকপট জবাবে হতভম্ব হয়ে যান। মাছের মতো মুখ হা করে কিছু বলতে চান, কিন্তু বলতে পারেন না। তাকে খুব অসহায় মনে হয়; আর সেই অসহায়ত্ব দেখেই হয়তো আমার হঠাৎ প্রচন্ড রাগ ওঠে। আমি হাত মুঠো করে থাকি। সে উল্টো-পাল্টা কিছু বললেই মাটিতে ফেলে পেটাবো। সে হয়তো ব্যাপারটা আঁচ করেই আস্তে করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়।

২

সেদিন ওদের সাথেই ড্রাইভিং শিখতে যাই। ওরা আমাকে দেখে বিভ্রান্ত হয়। বোঝার চেষ্টা করে আমি আসলে সমাজের কোন স্তরে বাস করি। ওরা কেউ কোনো কথা বলে না। নিজেদের মধ্যেও না। আমার সাথেও না। তিক্ত ঘটনার জন্যই হয়তো - পরিচালকও গৎ-বাঁধা বুলিতে আমাদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেন কেবল। কোনো গল্প করেন না। প্রথম দিনটা এভাবেই কেটে যায়।

৩

পরদিন সকালে গিয়ে কোনো অজানা কারণে আমি পরিচালকের সাথে দেখা করি। বলি, "ভাই আমি দলেই ড্রাইভিং শিখবো।"

তিনি অসহায়ের মতো মুখ করে বলেন, "রিসিট করে ফেলসি; এখন কিছু করলে মালিক আমাকে ধরবে। আপনি মালিকের সাথে কথা বইলেন।"

আমি বলি, "টাকা ফেরত লাগবে না; আমাকে ওই কালকের দলেই সাথেই দেন।"

উনি কেমন ভাবে যেনো আমার দিকে তাকান। বলেন, "ভাই এক কাপ চা খান?"

৪

পুরো কোর্সটাই আমি ওদের সাথে করেছি। প্রশিক্ষক আমার সম্পর্কে না জানলেও পরিচালক ভালো মতোই জানতেন। কিন্তু তিনি কখনোই ওদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেননি। প্রথমদিন ওই লোকটার আমাকে নিয়ে পক্ষপাতে যে সন্দেহ ওদের হয়েছিলো তাও কেনো জানি আর দানা বাঁধে না।

আমিও খুব সতর্ক থাকতাম। সাথে মোবাইল নিতাম না। যেদিন গাড়িতে আসতাম, স্কুল থেকে দূরে নামতাম। ওদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম, আমিও ওদের মতোই। জানিনা কেনো।

ওরা মোট ছয়জন ছিলো। বাংলাদেশের চারদিক থেকে প্রথম ঢাকায় এসেছে। শ্যামলী ড্রাইভিং স্কুলের হোস্টেল ছিলো, সেখানেই থাকতো। ঘুরে-ফিরে ওদের সবার সাথেই শিখতাম।

আমার নিজের গল্প চেপে রেখে আমি ওদের গল্প শুনতাম। গ্রামের গল্প, বাবা-মা' র গল্প, প্রেমিকার গল্প, স্বপ্নের গল্প। ওদের স্বপ্নও খুব সরল; ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভারের চাকরি; গ্রামে টাকা পাঠানো, দেনা শোধ, বোনের বিয়ে, ছোটো ভাইয়ের লেখাপড়া। আমার খুব অসহ্য লাগতো। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতো। ওরা আমাকে ঠাট্টা করে বলতো, "তুমার তো চেহারা-ছবি ভালো, কুনো ম্যাডামে তুমারে ঠিক ড্রাইভার বানাইয়া নিবো... হা হা হা" আমি ওদের সাথে গলা ফাটিয়ে হাসতাম। আর ভাব দেখাতাম, আমারো একটা ড্রাইভারের চাকরি দরকার, খুব দরকার!

ব্লগনাম: অমিত আহমেদ
বর্তমান অবস্থান: টরন্টো, কানাডা
ইমেইল: aumit.ahmed@gmail.com

তানবীরা তালুকদার

জীবন থেকে নেয়া

আমার কী দোষ?

১

আমাদের সময় বাংলাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর কিছু পরিবারে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার একটা হিড়িক লাগতো। সেই হিড়িক যারা সামলাতে পারতো তারা অবশ্য এরপর অনেকদিন টিকে যেতো। অনার্স, ক্ষেত্র বিশেষে মাষ্টার্স শেষ করেই দম নিতো। মাঝে মধ্যে অবশ্য দু' একজন প্রেমঘটিত কিংবা পরিবারঘটিত দুর্ঘটনার শিকার যে হতো না এমন কথা আমি অবশ্য বলছি না। দুর্ঘটনারতো কোনো হাত-পা নেই, তাই যে কোনো সময়ই সেটা ঘটতে পারে। আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার পর, রেজাল্টের আগে আমাদের এক বান্ধবী ঝরে পড়ার লাইনে গেলো।

আমাদের বান্ধবীদের মধ্যে প্রথম কারো বিয়ে হচ্ছে, খুশিতে আমরা আত্মহারা। বান্ধবীদের নিজেদের মধ্যে শাড়ী বদলাবদলি, চুড়ি বদলাবদলি সাথে ম্যাচিং দুল সব সারা। এখন শুধু উৎসবের সে দিনগুলোর অপেক্ষা। কোন বান্ধবীর বাড়িতে সাজব সবাই একসাথে, কে কাকে লিফট দেবে সব ছক-কাঁটা শেষ।

বান্ধবীর গায়ে হলুদের দিনে সেজে গুজে আমরা মনের আনন্দে আশপাশ ঘুর ঘুর করছি। গল্প-স্বল্প, গান-বাজনা হচ্ছে। সবাই সবার সাথে সামাজিক কথাবার্তা বলছে। একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা এমনি-ওমনি সবার খোঁজ নিচ্ছেন। তিনি আমারো খোজ নিলেন। দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি, বাবার বাড়ি ইত্যাদি - প্রভৃতি সবই। তখন এমনিতে আমাকে সবাই খেপাচ্ছিল, ঘটক উনি, দেখবি কাল যেয়ে তোদের বাড়িতে উপস্থিত হবেন। সবাই হেসেছে আমিও হেসেছি, খেল খতম - পয়সা হজম।

গায়ে হলুদ শেষ করে বেশ রাতেই বাড়ি ফিরেছি আর সুখ-স্মৃতি নিয়ে ঘুমাতে গেছি। পরীক্ষা শেষ, কাজতো কিছু নেই তাই সকাল সকাল বিছানা ছাড়ার কোনো তাড়াও নেই। কাজের মধ্যে কাজ ইউনিতে ভর্তির কোচিং-এ যাওয়া আর সেই উছিলায় বান্ধবীদের সাথে ইতি-উতি ঘুরে বেড়ানো।

কলেজ নেই, স্যারের বাসায় পড়া নেই মানে বাসা থেকে বেরুনোর কোনো সুযোগও নেই। পরদিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি খালাম্মা জাতীয় কারো অপরিচিত গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আওয়াজ শুনে তেমন গা করিনি, আমাদের বারো ভূতের বাড়িতে, পরিচিত থেকে আমার অপরিচিত মেহমান এর সংখ্যা অনেক বেশি। বোরখা পরে হাতে কলা কিংবা নাবিস্কোর বিস্কুট এর প্যাকেট নিয়ে খালাম্মা জাতীয় কেউ আসবেন যাকে গেটে আটকে দারোয়ান আমাদেরকে ডাকবে, আমরা চিনবো না কিন্তু দাদু তার পুরো হিস্ট্রি শুনে ঠিক চিনতে পারবেন উনি আমাদের এমন তেমন আত্মীয় হোন, আজকের জন্য অনেক দূরের আত্মীয় লাগে বটে কিন্তু এক সময় খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো, যাকে আমার বাবাও আমার সাথে অনেকটা এই প্রথমই দেখলেন। খালাম্মা জাতীয় মহিলার কথায় আঞ্চলিক টান থাকাতে তাকে আমি সেই দলে ফেলে রেখে নিশ্চিত মনে শুয়ে শুয়ে আসছে সন্ধ্যার সাজগোজের ব্যাপারে ভাবছি। বেলা এগারোটা গড়াতে উঠতেই হলো, নইলে মা আর আস্ত রাখবে না।

উঠে দেখি ওমা তিনিতো গতরাতের সেই খালাম্মা। তিনি আর তার সাথে আরো দু' জন খালাম্মা শ্রেনীর মহিলা। আব্বু দেখি ঝামেলায় পড়া হাসি হাসি মুখ করা আর মায়ের দেখি রাগত চেহারা। ফেটে পড়তে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না মুখ করে তাদের সাথে কথা বলছেন। আমাকে মা চোখে ইশারা করলেন যেনো সে ঘরে না ঢুকি, আমি না ঢুকতে পারলেই বাঁচি, আমি গদাই-লস্করী চালে গেলাম আমার আলসি দিনের খোজ করতে।

বিকেলে যখন রেডি হতে যাচ্ছি অনুষ্ঠানের জন্য বাঁধলো ক্যাচাল। মা আমাকে কিছুতেই আজকে ছেলের গায়ে হলুদে যেতে দেবেন না। ব্যাপার কী? ভাবতে চেষ্টা করলাম সারাদিন মা' কে চটানোর মতো কী কী করেছি?

বাড়ি থেকে বেরোনোর ব্যাপার থাকলেতো মা' কে চটানোর কাজ কিছু করি না।

ও, পর সমাচার জানা গেলো, ঘটনা হলো এই যে সকালে ওই খালাম্মা মহিলা আমেরিকা প্রবাসী কোন আইএ, বিএ ফেল কিন্তু ৫০ হাজার টাকা মাসে কামায় (সে সময়ে কনভার্টেড টু টাকা আমার ধারণা), এমন ছেলের সাথে আমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। শুধু প্রস্তাবই নিয়ে আসেননি, উপরন্ত ছেলের মা - খালাকেও সাথে নিয়ে এসেছেন। আমার জন্য বিয়ের প্রোপ্রোজাল আনাতে মায়ের গোস্বা না, গোস্বা হলো ওই আইএ, বিএ ফেল এ।

যেহেতু মহিলা আজকেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং হয়তো গোটা বিয়েতেই উপস্থিত থাকবেন, মায়ের ধারণা আমাকে হয়তো আমার অজান্তে একে তাকে দেখাবেন তাই আমার আর যাওয়া চলবে না। গায়ে হলুদে যেতে না পারলে বান্ধবীদের কাছে আমার প্রেষ্টিজ পাংচার হয়ে যাবে। সব্বাই ভীষন মজা করবে আর আমি এই আপাদমস্তক গ্রিল দিয়ে আটকানো বাড়িতে একা বন্দিনী হয়ে থাকবো? অথচ দিন-রাত টেলিফোনে, গল্পে গুটুর গুটুর করে এই বিয়ে নিয়ে কতোইনা পরিকল্পনা করেছি। এসব আমার হাত থেকে সব ফস্কে যাচ্ছে শুধু ওই অপরিচিতা খালাম্মার কারনে? কষ্টে আমি দিশেহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, এতে আমার কী দোষ? মা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তোরইতো সব দোষ, এত্তো মেয়ে বিয়ে বাড়িতে, শুধু তোর জন্য প্রস্তাব নিয়ে কেনো এলো ওই ফেল্টু ছেলের জন্য? তুই কী করেছিলি? আমি তব্ধা, একজন মেয়ে বান্ধবীর বিয়েতে কী এমন করবে যাতে পুরস্কার কিংবা শাস্তিস্বরূপ আর একজন তার ফেল্টু ছেলের জন্য প্রস্তাব নিয়ে রওয়ানা হবেন?

২

কাজিনের বিয়ে উপলক্ষ্যে প্রথম শাড়ি পড়েছি। আনন্দে সারা বাড়ি ছুটোছুটি করছি। সে সময় বিয়ে বাড়িতে বর-কনের জন্য চেয়ার না, ষ্টেজ হতো। বিয়েতে একটা পর্ব থাকতো নতুন বউয়ের মুখ দেখানোর। মুখ দেখানোর সময়টাতে ছেচকী, মেচকী, কেচকী সব যেয়ে বর-বউয়ের উপর হুমড়ী খেয়ে পরার একটা রেওয়াজ তখন ছিলো। ওহ্ তার আগে বরের জুতো মেয়ে পক্ষের বিচ্ছুরা কোনো একটা সুবিধাজনক সময়ে চুরি করে নিতো। আজকালের মতো এত সফিস্টিকেটেড বিয়ের প্রচলন তখন ছিলো না। মুখ দেখা-দেখি শেষ হলে বউ নিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে জুতো দরা-দরির একটা পর্ব চলত। তো মুখ দেখা-দেখির সময় আমিও সব ছেচকী-মেচকীর সাথে বর-বউয়ের উপড় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সে পর্ব শেষ মেয়েরা এখন সবাই ষ্টেজ থেকে নেমে কান্না-কাটি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হুড়োহুড়ি করে সবাই নামলেও আমি নামতে পারিনি শাড়ি সামলে। আমাকে কেউ নিচ থেকে এক পাটি জুতো দিয়েছে, সেটাতে পা দিয়ে নেমে আর এক পাটিতে যে না পা গলাতে যাবো, ছেলের এক বন্ধু এসে চিলের মতো ছো মেরে আমার জুতো নিয়ে "গন"। "গন" মানে এমন "গন" যাকে বলে হাওয়া। ছেলে পক্ষের দাবী তাদের ছেলের জুতো না দিলে তারাও আমার জুতো দেবে না।

কিন্তু হায় সে বৎস জানে না এ জুতো সে জুতো না। আগে এখন আমার ঐতিহাসিক জুতোর ইতিহাস বলি। আমার এসএসসি পরীক্ষার ঠিক আগে আগে আমার এক কাজিন কানাডা থেকে তার বোনদের জন্য জুতো পাঠিয়েছে বাংলাদেশে। কাজিন আমাকে জুতো দেখানোর সময়ে, জুতো আমি এমনি এমনি পড়েছি পায়ে ডিজাইন দেখতে কিন্তু পরে আর খুলতে পারছি না। এতই পছন্দ হয়েছে জুতো, এত আরাম যে আমার ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন সব ওই জুতোতে গিয়ে পড়ল। আমার খালাতো বোনও ওর ভাইয়ের পাঠানো জুতো আমায় কিছুতেই দিবে না। জুতোর জন্য আমার পরীক্ষা যায় যায় অবস্থা, শয়নে স্বপনে জাগরনে আমি শুধু জুতোই দেখি। অন্য খালাতো বোন আমার মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বলল, গুলশানে জুতোর অর্ডার নেয়, তুই সেখানে নমুনা দেখিয়ে অর্ডার কর। অর্ডার করতে যেয়ে ডবল কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছি তাদের মেটেরিয়াল আর মেকিং কস্ট শুনে। অতঃপর আমার চোখের পানি আর আব্বুর সুপারিশের জয় হলো। শুধুমাত্র পরীক্ষার স্বার্থে আম্মি এই আবদার সহ্য করে পনেরোশো টাকা দিয়ে আমার জন্য গুলশানে এক জোড়া জুতো অর্ডার

করলো। জুতো পরলে নষ্ট হয়ে যাবে এই মায়ায় আমি জুতো বুকে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটি। আমাদের মতো সাধারণ ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারে এক জোড়া জুতো পনেরোশো টাকা তাও আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগের কথা, বিশাল বিরাট ব্যাপার। আর সেই জুতো নিয়ে ওই নাদান পোলা হাওয়া! দুঃখে-বেদনায়-শোকে আমি মুহ্যমান, পাথর।

ছেলেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, তর্কাতর্কি শেষে টাকার রফা হলো, বর তার জুতো ফিরে পেলেন এবং সগৌরবে তার নতুন বউ নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন কিন্তু আমি জুতো ফিরে পেলাম না। আমি সিন্ডারেলা একপায়ে জুতো পরে বক বিবি হয়ে আকাশ পাতাল ভেদকারী চিৎকার কান্না করতে করতে বাড়ি এলাম। অন্যরা ভাবছে কাজিনের জন্য কাঁদছি।

আরে ধুত্তোর কাজিন, আমি মরছি আমার কানাডিয়ান লুক অ্যালাইক গুলশান জুতোর শোকে। জুতোর শোকে আমি পাগল কিন্তু ইতিমধ্যে পরীক্ষা শেষ। থিওরীতো বটেই প্র্যাক্টিকালও শেষ। মা আর আমাকে জুতো দেবেন না। আমি সিন্ডারেলার মতো এক পাটি জুতো নিয়ে দুঃখ মুখে ঘুরে বেড়াই।

মায়ের আবারো সেই একই প্রশ্ন, এত মেয়ে ছিলো বিয়ে বাড়িতে, কারো জুতো কেউ নিলো না, শুধু তোর জুতো নিলো কেনো? তুই কী করেছিলি, শুধু তোরই এমন হয় কেনো?

কিন্তু আমার কী দোষ?

ব্লগনাম: তানবীরা
বর্তমান অবস্থান: এন্ডহোভেন, নেদারল্যান্ডস
ইমেইল: tanbira.talukder@gmail.com

সুমন সুপান্থ

তার সঙ্গে রাতের ভেতর, চিতার গন্ধ থেকে

শঙ্খমালা এক নদীর নাম...কন্যার নাম নাচনেওয়ালী...!

- হুম, সেইবার গ্রামের দক্ষিণ মাঠে তাবু গেড়েছে ভিনদেশী সার্কাস দল। শিশু-বুকে ধুমধাম বাজছিলো উন্মাদনা। মানুষ কেমন করে ফেরারী হয়... তাবুতে তাবুতে কাটে দিন... যায় রাত! ইস্ এমন যদি হতো, আমিও একদিন...।

ঠিক দিন তো নয়, রাতে দেখি তারে। হ্যাজাকবাতির তীব্র আলোয়, সার্কাস নয় সেটা, যাত্রামঞ্চে মহুয়াপালা। বেদেকন্যার প্রেম-বিরহগাঁথায় সজল আরো কতোশতো চোখ... গলার কাছে আটকানো দলা! দেখি পৃথিবীর সব রুপ মেখে আছে যে মেয়ে, মঞ্চ থেকে একবার ও সে তাকায় না এইদিকে! জানে ও না তার তরে কেমন করে জ্বলাসাচ্ছিলো ক' খানি কচি পাঁজর...

তাবুতে তাবুতে ঘুরে ক্লান্ত রমনী কোথায় জানি আজ পেতেছে বসত। কোথায় জানি আলগোছে ধুলি সরানোর মতো করে পড়ে যাচ্ছে বিগতলিপি... হায় ঈশ্বর তাতে তুমি লিখো নি, কবে কোন কালে, এক কিশোর কুড়িয়ে রেখেছিলো এক গাছি চুলের ফিতা তার... তাতে বেদনার অধিক কুয়াশা জমে আছে আজ! তীব্র হুইসেলের মতো মগজে বাজছে পুনঃ পুনঃ বসন্ত এলে। দেখছে, অলক্ত রাঙা পা দু' খানিতে লেপ্টে আছে কার না কার চোখের জল!

কুসুমের কাছে রয়ে গেলো কিছু...কিছুটা বিগত, শশীর কাছে

হাতড়ে হাতড়ে কী খুঁজছিলে তুমি? জীবনের গোপনতম আলো-অন্ধকারের রেখা? ভোর হলে দীবা খালা বলছিলো শুধু "তুই বড় হয়ে গেছিস রে! কাল থেকে তুই আলাদা শুবি।" তোমার রক্তে নাচন

লেগেছিলো । লাগিয়েছিলো যে তরুনী মাসী, রুপ লাবন্য হারিয়ে সে যখন আজ থুত্থুরে নারী, তুমি শুধু বললে, "দেশে ফিরেই তোমাকে দেখতে এলাম খালা, তুমি তো আগের মতো নেই...!"

কিসের মতো? তোমার প্রথম পাঠের কালে অন্ধ অধিক রাতের মতো? না কি কুলকুল বয়ে চলা বিজনার অতল জলে লুকিয়ে রেখেছিলে যে আরো কিছু কথা... কম্পিত স্বরে যা না বললেই নয় - তার নিগূঢ় দৃশপটের মতো!

... তো, বলো কুমার, বুকের কাছে ও মুখ রেখে কহো তোমার গোপন কথা বলো

- "আরে না। শুধু কুয়াশা। ঘন হয়ে ঢেকে আছে চরাচর! একর কয়েক ধানী জমি। ধান কেটে নিয়ে যাওয়ায় সুনসান, বিরান... তার উপর মাতলের হাহাকার নিয়ে তীব্র হয়ে পড়ে আছে অই কুয়াশাদল... সেটা পেরুতেই এত ভয়... রাত তো নয়, সেই সকাল বেলা! বুকের কাছে আমসিপারাটা খুব করে লেপ্টে রেখে, বার কয়েক জননীর দিকে তাকিয়ে তবু মিলে না ভরসা। মা বলছিলো "আমি এই গাছটার নীচে দাঁড়ালাম। ক্ষণে ক্ষনে নাড়িয়ে যাবো। তুমি দেখবে গাছ নড়ছে, জানবে আম্মা এখনো দাঁড়িয়ে আছি এখানে। আর ভয় করবে না বাবা।"

মক্তবঘরে ঝমঝম কোরাসে ও নিজের বিপন্নতা আলগা হয়ে খুলে খুলে পড়ছিলো। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে দেখি জননী-গাছ নড়েই যাচ্ছে... আহা আমার মক্তববেলা! ছুটি শেষের ছিমছাম দুপুর, রক্তের মতো উজানে উঠে ঢের। জানায়, এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃশ্য নেই কোনো!

ব্লগনাম: সুমন সুপান্থ
বর্তমান অবস্থান: সুইন্ডন, যুক্তরাজ্য
ইমেইল: supanthoy@yahoo.co.uk

ফকির ইলিয়াস

যেভাবে কাছে আসে আরেকটি গদ্যগগন

১

মাটিতে মিশেছে ব্যথার পাঁজর। আমি খালি পায়ে স্পর্শ করি মাটির উর্বর বুক। ঢালু জমিনে এ কার আঁচড়! কে রেখে গেছে এমন উষ্ণ আঙুলের ছাপ! হাঁটি, হেঁটে যাই। সামনেই পরিচিত সেই হাট। যেখানে দিনমান দিতাম আড্ডা। উদাস সন্ন্যাস বুকে নিয়ে গুনগুনিয়ে গাইতাম "আজ কালার পিরীতে রে শ্যাম আজ কালার পিরীতে জাতি কুল আর শরম ভরম সব দিলাম তার হাতে।"

বাউল ফকির আরকুম শাহের ওরসে যে রাতে যাই, সে রাত ছিলো ভর পূর্ণিমার। চাঁদের সাথে ছায়া মিলিয়ে আমরা পৌঁছে যাই ওরস আঙিনায়। বাউলেরা গান গাইছেন প্রাণ খুলে। দোতরা আর বেহালার মূর্ছনায় একাকার হয়ে যাই। বাউল ফিরোজ শাহ তখন সুর তুলেন তার বেহালায়।

তোরা শোন গো সখিগন, বন্ধু আসিবে এখন
কোলাহল করিস না আমি বলি,
সাবধানে ফেলিও পায়ের তালি।
সারিবদ্ধ হয়ে সবাই দাঁড়িয়ে থাকিস
নীরব নিস্তব্ধ হয়ে বন্ধুরে দেখিস
তার রূপের ঝলকে, তোরা নাচিস পুলকে
বাসরে প্রদীপ দিও জ্বালি।
ফুলবাসরে প্রাণবন্ধু করবে আরোহন
চতুর্পাশ্বে সখি তোরা দাঁড়াবে তখন
ধুপ লোবান আগর, সুয়া চন্দন আতর
আনন্দে তার অঙ্গে দিও ঢালি।

তারপরে আমাকে তোরা সাজিয়ে দিও
হীরা আর স্বর্ণের অলংকার আমায় পরাইও
দিও শুভ্র বসন, হাতে মুক্তারই কাংকন
আমার বুকে দিও প্রেমের ডালি।
প্রাণবন্ধুকে দেবো আমি প্রেম উপহার
সবকিছু বিলিয়ে দেবো চরণে তাহার,
মিশবো তার সাথে, আর দেবো না যেতে
ইলিয়াস যাবে ভবের মায়া ভুলি।

তার গান তন্ময় হয়ে শুনি। তিনি গাইতে থাকেন। একের পর এক। মনে পড়ে যায় সাধক বাউল দুর্ব্বিন শাহের কথা। তাঁর গান।

সংগে যাইতাম ওরে ও মাঝি ভাই ঘাটে নাও ভিড়াইতে যদি,
সামনে ভরা নদী,
আমি পাড়া গায়ে বসত করি, সামনে ভরা নদী।

২

আমি কি বিরহী হয়েই জন্মেছিলাম? নাকি বিরহ দখল করে নিয়েছে আমার সত্তা? এমন প্রশ্ন অনেকবারই করেছি নিজেকে। উত্তর পাইনি। জিজ্ঞাসা করেছি আমার সেই সহপাঠিনীকেও। যে আমাকে স্বপ্ন দেখাতো। স্বপ্না পাল। তার নামের সাথে স্বপ্ন শব্দটি জড়িয়ে ছিলো বলেই হয়তোবা। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে সমান্তরাল রেললাইন। না, ঠিক সমান্তরাল বলা যাবে না। কিছুটা বেঁকে গিয়েছিলো মাঝে মাঝে। রাতের আঁধারে কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো রেললাইনের শক্ত কাঠের টুকরোগুলো। কিছু কালো পাথরখন্ড ও। ফলে রেললাইনটি প্রায় হয়ে পড়েছিলো পাঁজরশূন্য। আচ্ছা, মানুষ কেনো চুরি করে? কেনো অবৈধ ভাগ বসায় অন্যের দখলে! যে বাসিয়া নদী আমার জীবনশিল্পের সঙ্গী, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছি। আমার পিঠে হাত রেখে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না, দীনা, লিজারা। আজ কি কোনো কবিতা লিখা হয়েছে? অথবা গান! তারা জানতে চেয়েছে। একুশে কিংবা স্বাধীনতা-বিজয় দিবসের স্মরণিকায় লেখা পাঠিয়ে যে আমি নিজেকে লেখক মনে করতাম, সেই আমি চেয়ে থেকেছি স্থবির চোখে।

লেখা ছাপা হবার পর, সৌজন্য সংখ্যা সংগ্রহ করে পড়ে শুনিয়েছি ওদেরকে। আর দেখিয়েছি ছাপার অক্ষরে নিজের নাম!

৩

নিজেকে বেশ সাথিহীন মনে হলো স্বপ্নার বিয়ে হয়ে যাবার পর। ও আমাকে চিঠি লিখলো। বললো, আমি তো মেয়ে মানুষ। একজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষের ওপর ভর করে জীবন কাটিয়ে দেবার সাধই আজীবন লালন করেছি। তুমি ছেলে মানুষ। অনেক বড় হও। অনেক পথ যেতে হবে তোমাকে। প্রার্থনা করি তুমি বড় লেখক হও।

ওর প্রার্থনা সাথে নিয়ে আমি পথ চলি। আর সে দেশবদল করে। চলে যায় শিলং শহরে। কেনো জানি আমার মাঝেও দেশবদলের একধরনের নেশা দানা বাঁধতে থাকে ক্রমশঃ। আমার প্রথম বই "বাউলের আর্তনাদ" বের হবার পাশাপাশি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন ছাপা হয় স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায়। "বাহির হইয়াছে"। সে বিজ্ঞাপনটি দেখেই শিলং শহর থেকে আবার ও একটা চিঠি লিখে সে। জানায় একটা বই কি পাওয়া যাবে?

তাকে বই পাঠাই । দীর্ঘদিন বয়ে যায় ।

আমি সড়কের সন্ধানে পথ খুঁজতে থাকি। হাঁটি। পাড়ি দিই। বসত গড়তে আমার সময় লেগে যায়। যাযাবর জীবনের ঘ্রাণ নিতে নিতে উন্মত্ত হই।

৪

তারপর একদিন ফিরি ডেরায়। সেই বাসিয়ার পাড়ে। অনেক অপরিচিত মুখ আমাকে স্বাগত জানায়। কেউ চিনে আমাকে। কেউ ঠিক চিনতে চেষ্টা করে পিতৃদেবের মুখছবি সনাক্ত করে। আমার ভালোই লাগে। আচেনা

থাকার মাঝে মজাই আলাদা। আমি অনেকের খোঁজ নেবার চেষ্টা করি। সৌমিত্র পাল। স্বপ্নার ছোট ভাই। উঠতি ব্যাংকার। হাটে তার সাথে দেখা হয়ে যায়। প্রণাম দিয়ে সামনে দাঁড়ায়। সোবহান মিয়ার চায়ের দোকানে এক টেবিলে বসি। সৌমিত্র জানায়, স্বপ্নার বর সাত বছর আগেই প্রয়াত হয়েছেন। ২৬ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে স্বপ্না। ছোট্ট দু' ছেলে নিয়ে স্বপ্না শিলং শহরেই থাকে। একটা সেলাই দোকান দিয়েছে নিজেই। আমার মনে পড়ে যায় স্বপ্নার সেই চিঠির কথা। আমি তো মেয়ে মানুষ। একজন প্রতিষ্টিত পুরুষের ওপর ভর করে জীবন কাটিয়ে দেবার সাধই আজীবন লালন করেছি। তুমি ছেলে মানুষ। অনেক বড় হও।

৫

আমি সেই বাসিয়া নদীর তীরে গিয়ে বসি। কাঁদি প্রাণভরে। আমাকে কেউ বাধা দিতে আসে না। বাধা দিতে পারে না।

একঝাঁক সাদা বক আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। আমি তাকাই। তাকিয়ে দেখি বিধবা স্বপ্না সাদা শাড়ী পরে আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে । আমার কাঁধে তার হাত!

ব্লগনাম: ফকির ইলিয়াস
বর্তমান অবস্থান: নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল: BAUL98@aol.com

এম. এ. মুকিত

শুদ্ধতা

১

বাবাকে কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি, কেনো টাকাটা তিনি নিজেই আমার হাতে দিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী সে প্রসঙ্গটাই আমরা আর কখনো তুলিইনি। সে রাতে আমরা দু' জনই দু' জনকে সচেতনভাবে এড়িয়েছিলাম ঠিকই, তবে পরদিন থেকে এমন ভাব করেছি যেনো কিছুই হয়নি। এটা মনে আছে, বাবার মাথা নিচু হয়ে ছিলো, এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়েই তিনি ভেতরের রূমে চলে গিয়েছিলেন। একটুও মাথাটা উঁচু করেননি। এবং, এটাও ঠিক যে তিনিও জানেন, আমার মাথাটাও নিচুই হয়ে ছিলো। তিনি হয়তো দেখেননি, কিন্তু হয়তো বুঝেছেন অথবা ধারণা করে নিয়েছেন, অথবা হয়তো এখনও জানেননা - সে রাতের বাকিটা সময় আমি বারান্দায় বসে বোবা আর্তনাদে ফেটে পড়ছিলাম; আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই; আমার মনে হচ্ছিলো এখনো দৌড়ালে হয়তো লোকটার রিক্সাকে ধরা যাবে, তারপর রিক্সা থেকে হারামজাদাকে টেনে নামিয়ে এলোপাথাড়ি কিছু চড়-থাপ্পড়ও দেয়া যাবে; বাবাকে বলা হয়নি, সে রাতের পর কিছুদিন আমি এ স্বপ্নটা বারবার দেখতাম, দেখতাম আর অদ্ভুত আনন্দে ফেটে পড়তাম সাময়িকভাবে। তার পরপরই স্বপ্ন শেষ হয়ে যেত... আবার এসে ঘিরে ধরতো বিষাদ, অনুশোচনা, হতাশা, বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা... সব!

সেসময় আমার বারবার মনে হতো, "কী হয় এসব না হলে? কী হবে এত টাকা দিয়ে? এখন কি খুব খারাপ আছি? এরচেয়ে ভালো থেকে কী করবো? হাতি মারবো, না ঘোড়া মারবো? সামান্য একটা লোককে কিছু করতে পারলামনা! আবার হাতি-ঘোড়া!"

২

সংসারে সেই অর্থে অভাব না থাকলেও, যখনই যা মনে চাইতো, বাবা-মা' র কাছে তাই আবদার করার মতো অবস্থা আমাদের ছিলো না। হয়তো কোনোদিন এমন যায়নি যে না খেয়ে থাকতে হয়েছে, বা ছেঁড়া শার্ট তালি দিয়ে পরতে হয়েছে। তবে বাংলাবাজার থেকে বাবা যখন পাইকারী দরে পাঁচ ভাইবোনের জন্য সারাবছরের বাংলা, ইংরেজী আর অংক খাতা কিনে আনতেন, তখন স্কুলের নাম খোদাই করা খাতা না ব্যবহার করার কারণে ক্লাস টিচারের বকা খেয়ে চুপ করেই থেকেছিলাম, বাসায় ফিরে এসে মা' কে বলতে পারিনি যে "নতুন খাতা কিনে দ্যান।" এটা এমন কোনো ব্যাপার ছিলো না যে আবদার করলে মা রেগে উঠতেন বা অভাবের দোহাই দিতেন, কিন্তু এখন ভাবলে টের পাই, সেই ছয়-সাত বছর বয়েসেই চারপাশ দেখে "সংযম করে চলতে হবে" ব্যাপারটা ঠিকই বুঝে ফেলেছিলাম। পিকনিকের টাকা মা দেবে কিনা সেটা নিয়ে বোনদের টেনশন, "গত বছর তো তুই গিয়েছিলি, এবার আমি যাই" বলে ওদের নেগোসিয়েশন... এর সবই আমার চোখের সামনেই ঘটেছিলো। সব মিলিয়ে আমরা জানতাম, একেকটা পয়সার মূল্য অনেক। যেদিন ছায়াছন্দ বা বাংলা ছায়াছবির দিন ছিলো, আমরা ভাইবোনেরা আস্তে করে দরজার ছিটকিনি খুলে নিঃশব্দে চলে যেতাম পড়শীর বাসায়, ফেরার পরও কড়া নাড়তাম খুব সাবধানে। আমরা নিচু গলায় আক্ষেপ করতাম বাসায় টিভি নেই বলে, আবার একই সাথে ভাইবোনদের নিজেদের মাঝে আমরা ফিসফিস করে "আব্বা তো ঘুষ খায় না" বলে অনেক গর্বও করতাম। এখনও করি, যদিও বাবা রিটায়ারমেন্টে চলে গেছেন আজ আট-ন' বছর।

মাসের পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ সকালে আমি প্রস্তুত থাকতাম, কারণ একটু পরেই দামামা বাজবে। শুরু হবে বাবা-মা' র মাসিক ঝগড়া। আপারা সবাই স্কুলে চলে যেতো, বাবা-মা' র সেই মাসিক ঝগড়ার সাক্ষী থাকতাম আমি আর মামা। প্রতিমাসেই ঝগড়া, ঝগড়া করতে করতেই বাবা মা' র হাতে পরমযত্নে বানানো রুটি আর ভাজি দিয়ে নাশতা করে, চা খেয়ে, মুখ মুছে তবেই অফিসে যেতেন। কিন্তু ঝগড়াটা হতোই। ঝগড়ার বিষয়ও ছিলো প্রতিমাসে একই... বাবা আশ্চর্য হতেন "এত টাকা কিভাবে মাস শেষ হবার আগেই খরচ হয়ে যায়!" আর মা' র বক্তব্যটা ছিলো "এত কম টাকায় কিভাবে আট-দশজনের সংসার চলে সেটা যাতে উনি আরেকটু ঠান্ডা মাথায় ভাবেন!" যখন বড় হলাম, ক্লাস নাইন টেনে পড়তাম, তখন প্রতিমাসের এই ঝগড়া দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিতাম ব্যবসা করবো, আমাকে অনেক আয় রোজগার করতে হবে, অনেক টাকা হতে হবে আমার; আর সেইসাথে মনে মনে রবি ঠাকুরকে গালিগালাজ করতাম; "শালা, কতো সহজেই বইলা ফালাও হরিপদ কেরানী আর আকবর বাদশার মধ্যে কোনো ভেদ নাই! পাবলিকের খাজনার টাকায় পায়ের উপর পা তুইলা ঐসব কবিতা আমিও লেখতে পারতাম! হাহ্।"

কিন্তু এসবের পরও যেটা সবচেয়ে বড় পাওনা ছিলো সেটা সেই গর্ববোধ। বাবা-মা' কে নিয়ে নিখাদ গর্ববোধ। সে গর্ববোধটা আরো বড় হয়ে গেলো, যেদিন নিজের চোখে দেখলাম ড্রইংরুম থেকে একটা লোককে বাবা গালিগালাজ করতে করতে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, অথচ আমার এই বাবাকে আমি কোনোদিন সন্তানদের ছাড়া আর কারো প্রতি উঁচু গলায় কথা বলতেও শুনিনি। লোকটাকে সোজা দরজা দিয়ে বের করে দিয়ে বাবা গজগজ করতে করতে বলছিলেন, "কত্ত বড় সাহস! কত্ত বড় সাহস!" বারবার। পরে জেনেছিলাম, পাঁচলাখ টাকা ছিলো লোকটার হাতের খসখসে প্যাকেটটায়, সেই এরশাদ আমলের শেষ দিকে। সেই ঘটনার পর কখনো কখনো বাসে ওঠার জন্য স্প্রিন্ট করতে করতে যে "ইস্, এক বিকেলেই গাড়ী হয়ে যেতো আমাদের!"... এমনটা মনে হয়নি, তাও কিন্তু না। তারপরও আমরা ভাইবোনেরা বাবার সেই গোয়ার্তুমিতেই খুশি ছিলাম, মাস শেষের বাবা-মা' র ঝগড়া দেখে রবি ঠাকুরের উপর সাময়িক বিরক্তি আসলেও মনে হতো এমন ঝগড়া যেনো শেষ না হয়ে যায় কোনো কালে, কোনো ভুলে। প্রশ্ন জাগতো, আকবর বাদশা' র সাথে হরিপদ কেরানীর ভেদটা কোথায়?

যেদিন বুয়েটে ভর্তি হয়ে বাসায় আসলাম, বাবার শংকিত চেহারা আমি আশা করিনি। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে... এ নিয়েই তাঁর খুশি হবার কথা ছিলো, অথচ তিনি তা ছিলেন না! বিশেষ করে ছেলে যদি বন্ধুদের পাল্লায়

পড়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ঢোকে সেই নিয়ে তাঁর ভয় বেশি ছিলো! সেসময় ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষ করে সিভিল মানেই ঘুষখোর এমন একটা ইমেজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো সবখানে। বাবার বাঁধা দেয়ার উপায় ছিলো না, তবে প্রাণপণ হয়ে পড়েছিলেন ছেলে যাতে বোঝে যে তাকে উল্টোস্রোতে চলতে হবে। মনে আছে, সেজন্যই, কতরকম উপদেশ, কোরানের আয়াত, হাদীসের উদ্ধৃতি, তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা... সবকিছু সেসময়ই প্রথম মন খুলে শেয়ার করলেন। বিয়ের পরপরই নাকি মা' কে বেছে নিতে বলেছিলেন কী রকম জীবন মা চান; বলেছিলেন দু' টো পছন্দের কথা... একটা বেছে নিতে হবে। মা তৎক্ষণাৎই "টাকাপয়সার কষ্ট থাকলেও সৎভাবে বেঁচে থাকা"র পক্ষেই বলেছিলেন। এসব বাবা কেনো বলতেন সে কারণও আমি জানতাম; ঘুষ খেলে শুধু তিনি না, মা' ও সমান কষ্ট পাবেন... আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি। সেসময় বাবার নানান কথায় এটাও বুঝেছিলাম, বাবা চাকরিতে ঘুষ খেলে স্কুলের বন্ধুদের কাউকে দেখে আমার কখনো হিংসা করার কথা ছিলো না। বাবার ত্যাগের কথা শুনে ঘুষ খাবো না বলে কতটুকু পণ করেছিলাম মনে নেই, তবে এটুকু বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত এর চেয়ে বেশি গর্ববোধ এই জীবনে আর কোনোদিন কিছুতে হয় নাই।

নিজের ঘুষ না খাওয়া নিয়ে বাবার কতটুকু গর্ব ছিলো আমি জানিনা। তবে তাঁর ছেলে হয়েই আমি যদি এতটা গর্ববোধ করি, তখন এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মাসে মাসে লাখ লাখ টাকার হাতছানি উপেক্ষা করে কর্মজীবনের হার্ডল রেস পার হতে থাকা তাঁর নিজের গর্বটা আরো বেশিই ছিলো।

৩

আমাদের পিতা-পুত্রের সেই গর্বের শক্ত দেয়ালে একটা গর্ত করে দিয়ে গিয়েছিলো সেই লোকটা, যাকে আমি প্রায়ই স্বপ্নের ঘোরে প্রায় খুনই করে ফেলতাম। তারপর, স্বপ্নের শেষে তার পকেটের একশো টাকার নোটটা নিয়ে, টাকার গায়ের নাম্বার মিলিয়ে আমি হনহন করে বাসায় ফিরে আসতাম; চিৎকার করে বলতে চাইতাম, "আব্বা, দেখেন, আমার ঘুষ দেয়া লাগেনাই, এক পয়সাও ঘুষ দেয়া লাগে নাই।"

৯৬ এর জানুয়ারীর দশ তারিখ, যেদিন জাপান সরকারের মোনবুশো স্কলারশীপের রেজাল্ট এসেছিলো, মুখ থেকে আনন্দের হাসি সরাতে পারিনি এক মুহূর্তের জন্য... সেটা বাবা-মা দু' জনেই দেখেছিলেন নিশ্চয়ই। দেশে ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরি নিতে হবেনা, এই ভেবে ছেলের "সুযোগের অভাবে হলেও ঘুষখোর না হবার সম্ভাবনা"র বৃদ্ধি দেখে তাঁরা খানিকটা স্বস্তিও পেয়েছিলেন নির্ঘাৎ। আর, আমার নিজের চারপাশে তখন প্রতিটি দিনই ঈদ, চোখজুড়ে অনেক স্বপ্ন। মনের দুঃখ লুকোনো যায়, আনন্দ বা স্বপ্ন এগুলো কি লুকোনো যায়?

সেই আনন্দ, সেই স্বপ্ন প্রতিদিন বাবা-মা' র চোখে ধরা পড়ে, ছেলে দূরে চলে যাবে ভেবে যে কান্নাটা উথলে আসে সেটা চেপে রেখে হাসি হাসি মুখ করে তাঁরা তাকান ছেলের দিকে। জাপানের থাকা-খাওয়ার খরচ অনেক; সব খরচের পর বছরে অন্ততঃ একবার সেমিস্টার শেষের ছুটিতে দেশে এসে ঘুরে যেতে পারবে কিনা, সে হিসেব কষেন; হিসেব মিলবে কিভাবে? জাপানের থাকা-খাওয়ার খরচ তো আর আমার বাবা-মায়ের জানা ছিলো না। তাই শেষে হাল ছেড়ে দেন, চোখের পানি সংবরণ করতে করতে কাঁপাকাঁপা গলায় বলেন, "একবার দেশে আসার মতো বিমানভাড়া তোমাকে আমি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ, তুমি এসব নিয়ে ভেবো না"; তারপর হয়তো টোকিও-ঢাকার বিমানভাড়া কতো সেটা জেনে খানিকটা গম্ভীর হয়ে পড়েন, শূন্যের দিকে তাকান; বাবার সে চোখের দিকে তাকানোর সাহস আমার হয় না। মনে মনে ভাবতাম, একটু খারাপ চলে হলেও পয়সা জমিয়ে ঠিকই চলে আসবো বছরে একবার। এভাবেই চলছিলো আমার জাপান আসার আগের কয়েকটা দিন, সিনেমার মতো, সুখে ভরা, আবেগে ভরা, ভালোবাসায় ভরা, গর্বে ভরা... যেনো দ্যা আলটিমেইট ইউটোপিয়া।

আমার সেই আলটিমেইট ইউটোপিয়ার দিনগুলোতেই কাদা মাখাতে এসেছিলো লোকটা। আমি জানি, বাবা সে রাতে ভেবেছেন আমি তাঁকে

নিয়ে যে গর্ব করতাম সেখানে ফাটল ধরেছে; অথচ যেটা সত্য তা হলো, আমি বাবাকে কোনোদিন বলতে পারিনি, "সারাজীবন, সারাটা জীবন কষ্ট করে করে নিজেকে নিয়ে যে অসামান্য গর্বের মিনার আপনার গড়ে উঠেছিলো, সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে সেই মিনারে এত সহজে আঘাত হানতে দিলেন? এত বেশি ভালোবাসা কি উচিত?"

শূয়োরের বাচ্চা পুলিশ অফিসার, পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে তোমরা মানুষের বাসায় গিয়ে বসা দাও, ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যায়, বিস্কুটে কামড় দিতে দিতে চা খাও আর নির্বিকার ভাবে বসে বসে টিভি দেখো; ভাবো "না দিয়া যাইবো কই!" শালার সবই করো আর এটা টের পাওনা যে, পাসপোর্ট না হলে ছেলেটার সব আনন্দ শেষ হয়ে যাবে, এই ভেবে একশো টাকার নোট হাতে মাথা নীচু করে একজন যোদ্ধা যখন নতমস্তকে নিজের ছেলেকে বলে, "যাও, লোকটাকে দিয়ে এসো", তখন সেই একশো টাকার নোটটা কতো অসভ্য রকমের ভারী হতে পারে!

৪

সেদিন বাবা আমার কাছে আর আমি বাবার কাছে অদ্ভুত এক অপরাধবোধে ভুগেছিলাম... এটা নিশ্চিত। আমরা এ নিয়ে আর কথা বলিনি।

মাঝে মাঝে ভাবি, বাবা নিজে এসে আমার হাতে টাকাটা না দিয়ে অন্য কোনো ভাবেও তো লোকটাকে দিতে পারতেন।

আবার, মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা ঠিকই করেছেন, এটার দরকার ছিলো।

ব্লগনাম: জ্বিনের বাদশা
বর্তমান অবস্থান: টোকিও, জাপান
ইমেইল: mukit_tohoku@yahoo.com

পান্থ বিহোস

বসন্তের চৈতালী গ্রীষ্মে

আমাদের কুদ্দুইস্সা ইদানিং মি. রুহুল কুদ্দুস নাম ধারণ করেছে - আপনারা কি ব্যাপারটা জানেন? যদি জেনে থাকেন তাহলে এক হাত উপরে উঠান- না জানা থাকলে দুই হাত! কাহিনীটা আপনাদেরকে কিয়ত্ক্ষণের মধ্যেই জানাইতাসি। একটু সবুর ধরুন আংকেল এবং আপুরা।

চুপ খাইয়া বইসা থাকলে কাহিনী শুনবেন বিশ্বাস করুন। গোস্সা করলে ঠক্ খাইবেন ইহা একশ' হান্ড্রেড ভাগ সত্য বয়ান দিতাসি।

গ্রীষ্মের শেষ দিনে বসন্ত(?) আগমনের বার্তা দিতাসে কুমারীদেবী- তখনের কথা কহিতেসি।

সূর্য-দুপুরে আভার সাথে মোলাকাত হইলো ন্যুমার্কেটের কান্দায়, নীলক্ষেতের মুখে। যেইখানে খোকারা দাঁড়ায়া বাতচিত করে - লাগবোনি স্যার, আসলডা আছে।

কম্প্যাক্ট ডিস্ক খরিদ করার সদিচ্ছা মনে জন্মাইসিলো যারা, উহারা অবগত-কায়দা নব্য, চলে নিত্য।

আভা ফাঁকে লইয়া যায় ডেনা টাইনা। জিগায় - রাধিকার কী হাল- তবিয়ৎ?

বিষম খাই আমি।

বলি, জিগায়ো না বইনে - জানি না হিসেব ধরো। তবে মি. রুহুল কুদ্দুস সাহেবের কথা বয়ান দিতাসি, বিস্তারিত এখানে জানিয়ো।

আভা আপসেট খায়।

আমি আগে বাড়ি - বুঝলা কিনা, সেই হইলো আর কী!

সে কয়, রাধিকা তাইলে শেষ পর্যন্ত কুদ্দুইস্সারে...

মি. রুহুল কুদ্দুস - আমি শোধরানোর চেষ্টা করি।

রাখ তোর মিস্টার-ফিস্টার!

আভা- আমার বাল্য সখি; তেতে উঠে।

আমি পরম যত্নে হাস্য করি।

ঐ হিরোঞ্চি-গাজাখোরের পেছনে সেধলো সে..?

সেধে নাই- ঠুকা খাইছে বোধ হয়।

আভা আফসোস করে।

কি খবর এখন তার? কিয়ত্ক্ষণ চুপ থেকে জিগায় আভা।

জানি না। তবে মি. রুহুল কুদ্দুস ব্যবসার ভার বহন করিতেসে বহু কষ্টে। বিমানে চইড়া আগ্রা, ব্যাংকক কিংবা কক্সোস্বাজার গমন করে।

আভা আর অবাক হয় না এবার।

যথার্থ - বলে চুপ মেরে যায়।

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ন্যুমার্কেটের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে নীলতে চলে আসে অনায়াসে। হারিয়ে যায় অজানা ইথারে।

যেমনি করে আমি রুদ্রকে টপকিয়ে একজন রাধিকা কোনে এক মি. রুহুল কুদ্দুসের অন্তর্বর্তী হয়।

অতঃপর...

ব্লগনাম: পান্থ বিহোস
বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: bihoshk@yahoo.com

শামীম হক

সামার

একবার এক সামারে হঠাৎ করে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য সেটি আমার প্রথম বা শেষ চেষ্টা ছিলো না। কিন্তু খুব স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছিলাম তখন। সিগারেট যারা খায় তাদের থেকে দুরে থাকি, বেছে বেছে খাবার খাই, শরীর ঠিক করার জন্য হাঁটাহাঁটি করি। আমার বাসার কাছাকাছি খুব সুন্দর একটা পার্ক ছিলো। সেই সামারে পার্কের বিশাল বিশাল গাছগুলো নতুন পাতায় ভরে উঠেছিলো। প্রতিদিন বিকেলে কাজ শেষে ফিরে সেই পার্কে নিয়ম করে দু' টো চক্কর দেয়ার অভ্যাস করার চেষ্টা করছিলাম সেসময়।

এই চক্কর দিতে দিতে ষাটোর্ধ্য - হয়তো সত্তুরের কাছাকাছি - এক বৃদ্ধাকে চোখে পড়তে লাগলো প্রায়ই। এক একদিন একেকটি গাছের নিচের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখতাম তাঁকে। কেমন বিষন্ন মুখে, চোখে বিশ্ময় নিয়ে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমি ভাবতাম বৃদ্ধার মাথায় নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে। একদিন তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় চোখাচোখি হয়ে যায়। তিনি মিষ্টি করে হেঁসে গালে ভাঁজ ফেলে বলেন "হাই।" সেদিনের সুন্দর আবহাওয়া নিয়ে একটি মন্তব্য করেন। তখন মনে হয়েছিলো তিনি আর সবার মতই স্বাভাবিক একজন মানুষ!

এর পর থেকে তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় দু' এক মিনিটের জন্য থেমে টুকটাক কথা বলতাম, কুশল বিনিময় করতাম। যদিও মনে মনে কৌতুহল থাকলেও কখনো জিজ্ঞেস করিনি কেনো তিনি গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে চোখে পড়ে তিনি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার বেঞ্চে বসে পড়েন। আমি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করি তাঁর শরীর খারাপ কি না বা কোনো সাহায্য লাগবে কিনা। তিনি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে

উঠে দাঁড়ান। জানান, বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতা, তেমন কিছু না। তিনি পার্কের উল্টো দিকের একটি বাড়িতে থাকেন শুনে আমি তাঁকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে চাই। তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্মতি দেন।

আমার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে পার্কের গেটের দিকে যেতে যেতে নিজের মনে কথা বলছিলেন তিনি সেদিন। বলছিলেন, তিনি বড় হয়েছিলেন কান্ট্রি সাইডে। বিশাল পরিবারে অনেক ভাই-বোনের মাঝে তিনি ছিলেন সবার ছোটো। খুব যখন ছোটো ছিলেন, তখন বাবার সাথে অন্য ভাই বোনসহ বাবার চাষাবাদের মাঠে যেতেন। ছোটো ছিলেন বলে তখনও কিছুই করতে হতো না তাঁর, তবুও যেতেন বাবার আদরের লোভে। অন্য ভাই-বোনেরা যখন বাবাকে সাহায্য করতো তিনি তখন কাছেই কোনো একটি গাছের নীচে বসে খেলতেন আর গাছের সাথে কথা বলতেন।

আমি তাঁর কথা বুঝতে পারিনি ভেবে জিজ্ঞেস করেছিলাম "কী করতেন?" তিনি হেঁসে বলেছিলেন, তখন তিনি ভাবতেন গাছেরা তাঁর উপস্থিতি টের পেতো। মনে মনে তিনি কথা বলতেন তাদের সাথে। বাতাসে যখন গাছের পাতায় শোঁ শোঁ শব্দ তুলতো, তিনি ভাবতেন গাছেরা তার কথার জবাব দিচ্ছে।

এর পর বড় হয়ে গেছেন। প্রেমে পড়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সাথে। ভালোবাসার মানুষটিকে বিয়ে করে চলে এসেছেন শহরে। ভুলে গিয়েছেন ছোট্টবেলার সেই অদ্ভুত দিনগুলো, ভুলে গিয়েছেন গাছের সাথে কথা বলার দিনগুলো। ছেলেমেয়ে হয়েছে, সংসার বড় হয়েছে, দ্রুত সময় কেটে গেছে, যৌবন পেরিয়ে গিয়েছে, জীবন পেরিয়ে গিয়েছে। এখন জীবনের বেশির ভাগ পার করে শেষ কোঠায় এসে একা হয়ে গেছেন। সবেচেয়ে ভালোবাসা সবচেয়ে ভালো মানুষটি চলে গিয়েছেন। ভাইবোনসহ অনেক আপনজনেরা চলে গিয়েছেন একে একে। ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে, যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অফুরন্ত সময় এখন তাঁর হাতে। একা বাসায় সময় কাটে না। আবার মনে পড়তে শুরু করেছে গাছের সাথে কথা বলার দিনগুলো। তাই ক'দিন ধরে পার্কে আসছেন এখনো সেই ছেলেবেলার অনুভূতি হয় কি না দেখতে।

আশ্চর্য! গাছেদের পাতায় শোঁ শোঁ শব্দ শুনলে তাঁর এখনো মনে হয় তিনি এলেই গাছেরা তাঁর উপস্থিতি টের পায়, তাঁর সাথে কথা বলে।

ব্লগনাম: শামীম হক
বর্তমান অবস্থান: মিনিয়াপোলিস, যুক্তরাষ্ট্র
ইমেইল: shamimhawk@yahoo.com

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

আমি যখন চুর আছিলাম...

১

আমি মানুষটা এখন বেশ ভালো হইলেও এককালে ওস্তাদ চোর ছিলাম...

চুরি করে অবশ্য বাড়ি-গাড়ি-সিংগাপুরের একাউন্ট বানাতে পারি নাই, তবে দিনের পর দিন মোটামুটি নিরলসভাবে চুরিবিদ্যা অব্যাহত রেখে বন্ধুমহলে ওস্তাদ চোর হিসাবে বেশ নাম করে ফেলেছিলাম...

ঘটনা যখন নটরডেমে ভর্তি হই তখনকার... আমাদের বাসায় টাকা-পয়সা একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার ছিলো, স্কুল লাইফের প্রায় পুরাটাই পার করেছি টাকা-পয়সার চেহারা না দেখে... বাসার পাশে স্কুল আরক পাশে স্যারের বাসা "টিফিন নিবা বাসা থেকে বাইরের খাবার খাওয়া ভালো না" এইসব নানাবিধ ফালতু নিয়ম কানুনের ফাঁদে পড়ে ফার্মের মুরগির মতো বড় (এবং মোটাতাজা) হচ্ছিলাম... কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে দেখা গেলো দিন বদলাচ্ছে... ক্যান্টনমেন্ট থেকে নটরডেম যাওয়া সোজা কথা না, অনেক যন্ত্রণা, অনেক সময় এবং টাকা লাগে... কাজেই সমস্ত নিয়মকানুনের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমার জন্য কিছু দৈনিক বরাদ্দ দেয়া হলো...

দৈনিক ভাতা যে খুব হাতিঘোড়া রকমের তেমন না... আমার ওস্তাদ বাপজান খোঁজখবর নিয়ে আসা-যাওয়ার ভাড়া যতো লাগে হিসাব করে পাই-পয়সা হিসাবে বরাদ্দ শুরু করলেন...

দুই চারদিন ভালো ছেলের মতো গেলাম, তারপরে ফাঁক-ফোকর বের করলাম... ফার্মগেট থেকে ছয় নাম্বারের বদলে যদি লক্কড় মার্কা লোকালে উঠি তাহলে তিন টাকা কম খরচ হয়, মতিঝিল থেকে শাহবাগ বিআরটিসির বদলে লোকাল বা টেম্পুতে আসা যায়, এই টাইপ হাবিজাবি... অল্প কিছু টাকা বাঁচে, তা দিয়ে মাসুদরানা কিনি... তখন রানার পুরান বইগুলি দু' খন্ড একসাথে করে রিপ্রিন্ট হয়... "অগ্নিপুরুষ", "সেই উ সেন", "অপহরণ" কিংবা "আই লাভ ইউ ম্যান" নিয়ে ডুবে থাকি...

কয়দিন পরে ধৈর্য্যে টান পড়লো, এই দুই চার টাকা করে জমায়ে একটা বই কিনতে দুই সপ্তা লাগে, কাঁহাতক সহ্য করা যায়...

তখন বিকল্প বুদ্ধি বের করলাম... কিছু পোলাপান আগে থেকেই দেখতাম বিআরটিসিতে কাছাকাছি স্টপের টিকেট কিনে একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে নামতো, সাহস করে একদিন আমিও করে ফেললাম... চার টাকার টিকেট কিনে দশ টাকার রুট, এক ধাক্কায় ছয় টাকা নিজের পকেটে...

সারা রাস্তা অবশ্য গেলো ভয়ংকর রকমের টেনশন নিয়ে, গম্ভীর কাউকে পেছন দিকে আসতে দেখলেই মনে হয় এই লোক টিকেট চেকার (তখন বিআরটিসিতে রেগুলার চেকিং হইতো না, মাঝে মধ্যে... ঝটিকা অভিযান আর কী..) ..ফার্মগেটে বাস থেকে নেমে হাঁফ ছাড়লাম, আর করবো না এই কাজ... পরের দিন থেকেই আবার শুরু করলাম...

আস্তে আস্তে ওস্তাদ হয়ে গেলাম... খেয়াল করলাম মাঝরাস্তায় কিছু কিছু স্টপেজ থাকে যেগুলিতে অনেক মানুষ নামে... একদম কাছের টিকেট না নিয়ে এইসব বিজি স্টপেজের টিকেট কিনলে হেলপার মনে রাখতে পারে না... আরো ভালো ব্যবস্থা হইলো ইন্স্যুরেন্স টিকিট... অনেক সময় ব্যস্ততায় টিকেটম্যানরা টিকেটে ডেট দিতে ভুলে যেতো, সেরকম দু' টা টিকেট যত্ন করে ওয়ালেটে রেখে দিতাম, চেকিং হলে দেখানোর জন্য (সত্যি সত্যি একবার চেকিংয়ে পড়েছিলামও, কিন্তু সেই তারিখবিহীন টিকেট দেখানোয় বেঁচে গেলাম, তবে ব্যাটা টিকেটটা আর ফেরত দিলো না) ...

এইভাবে বেশ অনেকদিন চললো, আমার মাসুদরানার কালেকশন দিন দিন ভারী হতে লাগলো, মাঝে মাঝে রানা বাদ দিয়ে কিছু জাফর ইকবালও কিনে ফেললাম, তারপর একদিন স্বয়ং বাংলাদেশ সরকার তার পরিবহন খাতকে অর্থলোলুপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন... আমি

ম্যাট্রিকের স্কলারশিপের এক বছরের টাকা একসাথে পেয়ে গেলাম... এবং সেইবার কোনো কারণে টাকাটা আমার হাতেই রইলো (হয় চেকের বদলে ক্যাশ দেয়া হয়েছিলো সেবার অথবা চেকটা বাপের বদলে আমিই ভাঙিয়েছিলাম, পরিষ্কার মনে নাই..)

এম্নিতেও রানার বইগুলি ততদিনে নীরস হয়ে যাচ্ছিলো, তার উপর আর্থিক সমস্যার মোটামুটি সাময়িক একটা সমাধানের পর হঠাতই ঠিক করলাম, অনেক হইছে আর না...

সেই দিন থেকে আমি ভালো মানুষ... গল্প শেষ, টাটা...

২

এতক্ষণ যেটা বললাম সেটা আসলে পুরাপুরি না-বলা কথা না, বন্ধুবান্ধবেরা অনেকেই জানে, কেউ কেউ তখন সাথি ছিলো এখন সুশীল সেজে "চুর" বলে খোঁটা দেয়... কিছু একটা লিখতে ইচ্ছা করলো তাই লিখলাম...

সত্যিকারের যেটা না বলা কথা, সেটা আসলে কখনোই বলতে পারবো না... তবে যদি সম্ভব হতো একজনকে খুঁজে বের করে চোখে চোখ রেখে বলতাম, দশ বছর আগে আমি খুব বড় একটা অপরাধ করেছিলাম, ক্ষমা করো... আমি জানি সে ক্ষমা করতো...

কিন্তু ফেইসবুকে নাম লিখে সার্চ দিয়ে এই মানুষটাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না...

কিছু কথা না বলা হয়ে থেকে যাবে চিরদিন...

ব্লগনাম: কিংকর্তব্যবিমূঢ়
বর্তমান অবস্থান: অটোয়া, কানাডা
ইমেইল: fahim.shafayat@gmail.com

কাঠগড়ায় গল্প

সচলায়তন বিষয়ভিত্তিক সংকলন: না বলা কথা

ফাল্গুন ১৪১৫
প্রকাশায়তন, ঢাকা- ১২১৩
ISBN 984-300-003082-7